অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

# চক্রপুরের চক্করে

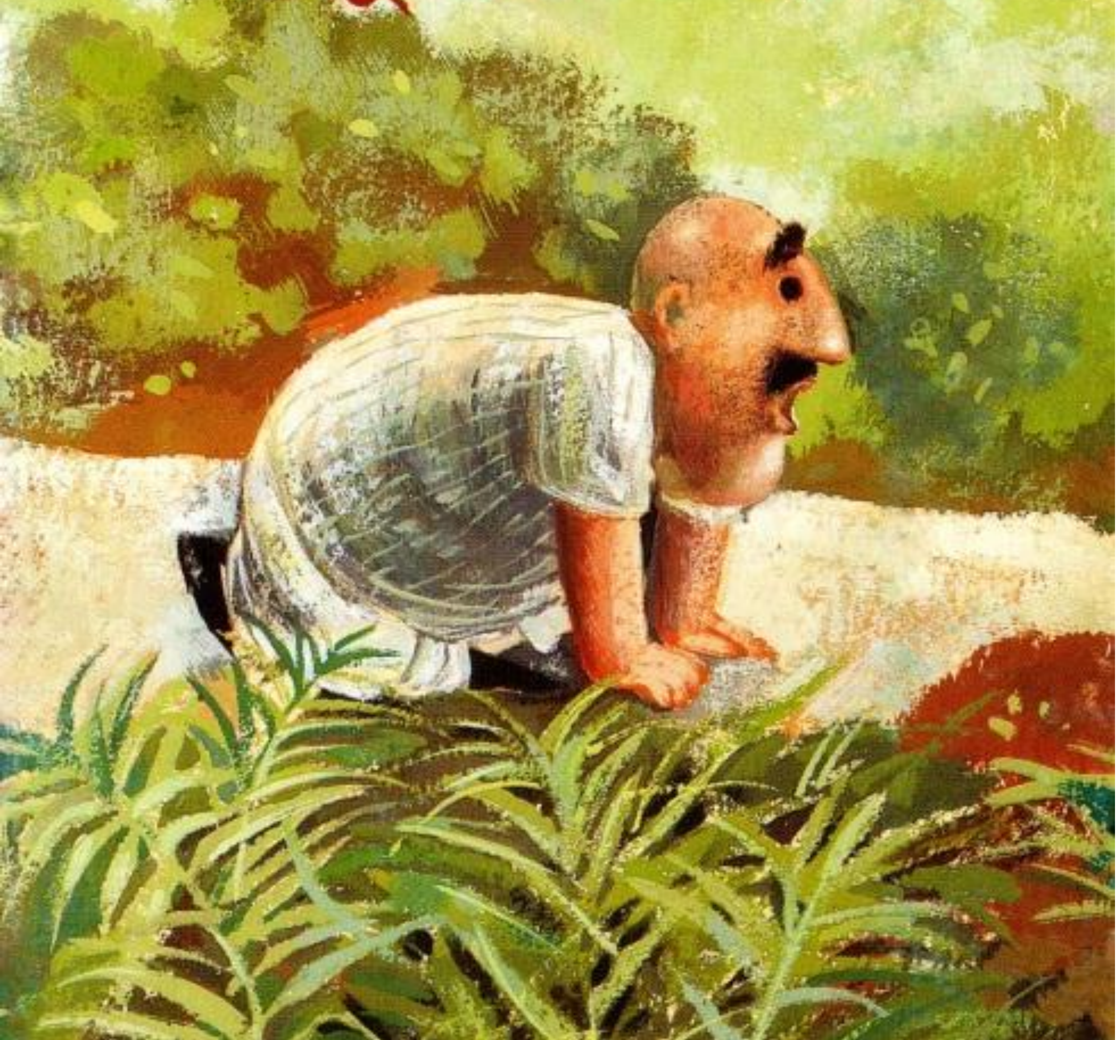

# চক্রপুরের চক্করে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সুব্রত চৌধুরী

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯০ পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

© শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বশ্বত্ব সংরক্ষিত প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-974-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং

বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

“রা-স্বা’

শ্রীমতী তিলোত্তমা বসু শ্রীমান কৃষ্ণপ্রণাম বসু

সকালের আপ ট্রেন থেকে একটা লোক যখন লটবহর নিয়ে হুড়মুড়িয়ে চক্রপুর রেল স্টেশনে নেমে পড়ল তখন পোর্টার লাখন আর স্টেশনবাবু সতীশ দত্ত দুজনেই কিছু অবাক হয়েছিল। চক্রপুর নিতান্তই ব্রাঞ্চ লাইনের খুদে একটা স্টেশন। এখানে শহর গঞ্জ বলে কিছু এখন আর নেই। লোকজন বিশেষ যায়ও না, আসেও না ।

লোকটার সঙ্গে একটা কালো ট্রাঙ্ক, একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা টিফিন ক্যারিয়ার আর জলের বোতল। লাল মতো ইতিউতি চাইছে দেখে সতীশ একটু এগিয়ে গেল।

“কুলি খুঁজছেন নাকি? এখানে কিন্তু কুলিটুলি পাবেন না। ...” লোকটা দেখতে সরল সোজা ভালমানুষের মতো। রংটি কালো, বেশ মোটাসোটা, মস্ত গোঁফ আছে, পরনে ধুতি আর সাদা শার্ট। সতীশের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে লোকটা একটু চাপা গলায় বলল, “এখানে একটু লুকিয়ে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে?”

সতীশ অবাক হয়ে বলে, “লুকিয়ে থাকবেন? লুকিয়ে থাকবেন কেন?”

লোকটা একটা সবুজ রুমালে মুখটা ঘষে-ঘষে মুছতে-মুছতে বলল, “আমার বড় বিপদ যাচ্ছে মশাই। একটা খুনের মামলায় সাক্ষী দিয়ে এমন ফেঁসে গেছি যে, আর কহতব্য নয়। তা এখানে একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকার ব্যবস্থা নেই?”

লোকটার ভাবভঙ্গি আর কথা বলার ধরন এমন যে, বিপদের কথা শুনেও সতীশের একটু হাসি পেয়ে গেল। হাসিটা চেপে সে গম্ভীর হয়ে বলল, “লুকিয়ে থাকা তো দূরের কথা, এখানে মাথা গোঁজার জায়গাই নেই। চক্রপুরে এসে আপনি ভুল করেছেন।”

লোকটা হতাশ হয়ে ধপ করে ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়ল। তারপর আপন মনে মাথা নেড়ে বলল, “ভুল করাটাই আমার স্বভাব কিনা। যা-ই করতে যাই সেটাতেই গণ্ডগোল। তা এটা ঠিক-ঠিক চক্রপুরই বটে তো!"

“আজ্ঞে, এটা ঠিক-ঠিক চক্রপুরই বটে। ওই তো স্টেশনের সাইনবোর্ডে লেখাও আছে।”

লোকটা ঘাড় নেড়ে বলে, “তা হলে জায়গাটা ভুল করিনি বোধ হয়। এইখানেই আমাদের আদি বাড়ি ছিল। যদিও পঞ্চাশ-ষাট বছর হল বসবাস উঠে গেছে। এখানে শুখানালা বলে একটা জায়গা আছে কি?”

সতীশ ভ্রু কুঁচকে বলল, “শুখানালা? নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। তবে ঠিক ...”

কখন লাখন এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বলল, “হাঁ হাঁ, শুখানালা জরুর হ্যায়। হুই দিকে যো শালজঙ্গল আছে, তার ভিতরে। উখানে তো এখুন জঙ্গল ছাড়া কুছু নাই।”

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, “এরকমই হওয়ার কথা । কবে বসত উঠে গেছে, বাড়িঘরও নিশ্চয়ই লোপাট। আমি অবশ্য কখনও আসিনি এখানে। তবে বাপ ঠাকুদার মুখে চক্রপুরের কথা শুনেছি।”

সতীশ বলে, “তা এখন আপনি করবেন কি? শুখানালায় পৈতৃক বাড়ির সন্ধানে যাবেন নাকি?”

লোকটা দুশ্চিন্তায় তোম্বা মুখখানা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “আমার যা বিপদ যাচ্ছে সে আপনাদের বোঝাতে পারব না। আচ্ছা, এখানে কোনও সদাশয় সাহসী লোককে কি পাওয়া যাবে, যে প্রয়োজনে একটু-আধটু মিথ্যে কথা বলতে পারে?”

সতীশ এবার আর হাসি চাপতে পারল না। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, “এরকম লোক দিয়ে কী করবেন?”

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, “সদাশয় না হলে আমাকে আশ্রয় দেবে না, সাহসী না হলে বিপদ-আপদ ঠেকাবে কে, আর মিথ্যে কথা না বললে আমাকে বাঁচানো সহজ হবে না। পানু মল্লিকের দল আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।”

সতীশ এবার আরও একটু গম্ভীর হয়ে বলে, “তা হলে বলতেই হয়, আপনি এখানে এসে ভুল করেছেন। এখানে মানুষজনের বসতি বিশেষ নেই। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-চারঘর মানুষ আছেন বটে, কিন্তু সেখানে সুবিধে হবে না।”

লোকটা মাথা চুলকোতে-চুলকোতে মহা-ভাবিত হয়ে বলল, “তা হলে তো খুব মুশকিল হল মশাই। এ তো দেখছি বেঘোরে প্রাণটা যাবে। ভেবেছিলুম পৈতৃক ভিটেয় এসে পড়লে পাড়া-প্রতিবেশীরা ফেলবে না। এ তো দেখছি পাড়াই নেই। এখন কী করা যায় একটু বলতে পারেন?”

সতীশের একটু মায়া হল। লোকটার মুখচোখে বিপন্ন ভাব দেখে সে বলল, “এ-বেলাটা আমার কোয়াটারে বিশ্রাম নিতে পারেন। তারপর ভেবে দেখা যাবে।”

লোকটা বেজার মুখ করে বলে, “স্টেশন বড় উদোম জায়গা । লোকের নজরে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।”

“তা হলে কী করবেন?”

“আচ্ছা, এখানে কি চোর-ছাঁচড়ের খুব উৎপাত আছে? না থাকলে মালপত্রগুলো স্টেশনেই রেখে আমি বরং বাপ-পিতেমোর ভিটেটাই একটু দেখে আসি। তারপর যা হওয়ার হবে। কী বলেন!”

লাখন এবার এগিয়ে এসে বলে, “আহা-হা, জঙ্গলে গিয়ে হােবেটা কি? দু-চারটাে রোটি খেয়ে লিন, একটু চা-পানি ভি পিয়ে লিন, তারপর ঘুমনে যাবেন।”

কিন্তু লোকটার এমনই অবস্থা যে, এসব ভাল প্রস্তাব গ্রহণই করতে পারছে না। মাথা নেড়ে বলে, "না বাবা না, পরের গাড়িতেই পানু মল্লিকের খুনে গুণ্ডারা চলে আসতে পারে। স্টেশন বড় ভয়ের জায়গা। "

সতীশ বলে, "পরের গাড়ি সেই সন্ধের পর। আপনার কোনও ভয় নেই। তা ছাড়া একা-একা জঙ্গলে ঘুরে শুখানালা খুঁজে বের করাও সহজ নয়। এ-বেলাটা কাটিয়ে ও-বেলায় গাঁয়ের লোক বা রাখাল-ছেলে কাউকে সঙ্গে দিয়ে দেবখন।"

অগত্যা লোকটা যেন খানিকটা অনিচ্ছের সঙ্গেই রাজি হয়ে গেল।

বিপদে পড়লে মানুষের খিদে-তেষ্টা থাকে না। এ-লোকটারও দেখা গেল তাই। স্নানটান করার পর লাখন যখন গরম-গরম রুটি আর আলু-মরিচের তরকারি বেড়ে দিল তখন লোকটা তেমন খেতেই পারল না । অথচ লাখনের রুটি-তরকারি সতীশের জিভে অমৃতের মতো ঠেকে।

"খাচ্ছেন না যে বড়!"

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আর খাওয়া! যখনই কিছু খাই তখনই মনে হয় এই শেষ-খাওয়া খাচ্ছি। মুখের খাবার যেন ছাই হয়ে যায়।"

"ঘটনাটা একটু খুলে বলবেন? আপনাকে দেখে তো ভাল লোক বলেই মনে হয়, খুনের মামলায় জড়ালেন কী করে?"

লোকটা অকপটে বলল, "আজ্ঞে, আপনার অনুমান যথার্থ, আমি সত্যিই বেশ ভাল লোক। এমনকী খুব ভালও বলা যায়। তবে এতটা বললে আবার নিজের মুখে নিজের প্রশংসা হয়ে যায় বলে একটু চেপেই বলছি। আর খুনের মামলার কথা কী আর বলব মশাই। দুনিয়ায় ভাল লোকদেরই আজ দুর্দিন। স্বচক্ষে দেখা খুন। কিন্তু পানু মল্লিকের লোকেরা আমার গলায় গামছা দিয়ে কথা আদায় করেছিল, আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, ধর্মাবতার আমি খুনটুন কিছু দেখিনি। বলতুমও তাই। কিন্তু বাধ সাধল কী জানেন? মহাত্মা গান্ধীর একখানা

ছবি। এজলাসের দেওয়ালে ছবিটা টাঙানো, নীচে আবার লেখা সত্যমেব জয়তে। দেখে কেমন যেন হয়ে গেলুম। আমার মনে হল, না, যা থাকে কপালে, আজ বুক ঠুকে সত্যি কথাটাই বলে ফেলি। আর সেটা বলেই তো এই বিপদ।”

সতীশ জিজ্ঞেস করল, “পানু মল্লিক লোকটা কে?”

“ও বাবা, সেই তো পালের গোদা। দিনে-দুপুরে হাতে মাথা কাটে।”

“সাক্ষী দিয়ে আপনি পালালেন কী করে? তার স্যাঙাৎরা ছিল না?”

লোকটা মাথা হেলিয়ে বলল, “খুব ছিল। এজলাসে তাদের চোখ জোড়া-জোড়া টর্চবাতির মতো আমার ওপর ফোকাস হচ্ছিল। আমি সাক্ষী দেওয়ার পরই বুঝলুম, এজলাস থেকে বাড়ি যাওয়ার পথেই আমি খুন হব। তাই একজন পুলিশ অফিসারকে সার্পটে ধরে বললুম, সার, আমাকে একটু এগিয়ে দিন। তা লোকটা মন্দ নয়। জিপ গাড়িতে তুলে খানিকদূর এগিয়েও দিল। আমি নেমে চোঁ-চা দৌড়ে সোজা স্টেশনে এসে গাড়ি ধরেছি।”

বিস্মিত সতীশ বলল, “তা হলে এইসব মালপত্র আপনাকে দিয়ে গেল কে?”

লোকটা ততোধিক বিস্মিত হয়ে বলে, “মালপত্র। মালপত্র আসবে কোথা থেকে?”

“এই যে ট্রাঙ্ক, সুটকেস, টিফিন ক্যারিয়ার এসব কোথা থেকে এল?”

লোকটা যেন কাঁচা ঘুম থেকে উঠল এমন অবাক চোখে মালপত্রগুলোর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, “তাই তো!”

“এগুলো কি আপনার নয়?” লোকটা সবেগে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, “কস্মিনকালেও নয়। এসব কি আমি সঙ্গে করে গাড়ি থেকে নেমেছি?”

“আলবাত। আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ওই লাখনকে জিজ্ঞেস করুন না?”

লাখনও সায় দিল, “হাঁ হাঁ, জরুর। ইসব তো আপনারই মাল আছে বাবুজি।”

লোকটা জিভ কেটে মাথা নেড়ে বলে, “ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে মশাই । মাথাটারও ঠিক নেই। ট্রেন থেকে নামার সময় আনমনে কার মালপত্র যেন নামিয়ে ফেলেছি। ব্যাপারটা কী জানেন? ওরকম একটা কেলে ট্রাঙ্ক, ওরকম একটা বাদামি সুটকেস আর ওই স্টিলের টিফিন ক্যারিয়ার আর জলের বোতল আমারও আছে। যখন যেখানে বেড়াতে যাই তখন ওই চার পিস মাল আমার সঙ্গে থাকেই। অভ্যাস কি না। নামবার সময় ওই চারটে সামনে দেখে মনে হয়েছে বুঝি আমারই জিনিস। এ হে, এ যে ভারী গণ্ডগোল হয়ে গেল !"

সতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “খুবই গণ্ডগোল। যার মাল সে যদি এখন পুলিশে খবর দেয় তো আপনার বিপদ আছে।”

লোকটা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, “আজ্ঞে আমার বিপদের আর অভাব কি? চারদিকে বিপদের একেবারে ঢেউ খেলছে।”

সতীশ হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় বলল, “ওঃ ভাল কথা, আপনার টিকিটটা কিন্তু এখনও দেননি। রেলের টিকিটটা কোথায়।”

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, “নেই । টিকিট কাটার সময় হল কোথায় বলুন! দৌড়ে এসে ট্রেন ধরলুম যে।”

“তা হলে বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবে আপনার আরও কিছু ঝঞ্ঝাট আছে। ফাইনসহ গাড়িভাড়া দিতে হবে।”

“একেই কি লোকে বিপদের ওপর বিপদ বলে?”

“হাঁ, এটাই হল বিপদের ওপর বিপদ।”

লোকটা কাহিল মুখে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, “এখানে কি রেল পুলিশ বা থানা আছে?”

“এখানে না থাকলেও পরের স্টেশনে আছে। টরেটক্কা করে দিলেই বেলা দশটার ডাউন গাড়িতে ফোর্স চলে আসবে। এই স্টেশনে আজ অবধি একটি লোকও আমার হাতে পার পায়নি। টিকিট না থাকলে হয় জরিমানা দাও নয়তো স্টেশনের ঘরে বসে থাকে, পুলিশ এসে নিয়ে যাবে।”

লোকটা চারদিকে টালুমালু করে চাইল। তারপর হঠাৎ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, “একটু জল খাব। গলাটা বড় শুকনো লাগছে।”

লাখন তাড়াতাড়ি পেতলের ঘটিটা এগিয়ে দিল। লোকটা ঢকঢক করে ঘটি খালি করে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আচ্ছ একটা কথা আছে না, বিপদ কখনও একা আসে না!"

“আছে।”

লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, “ইয়ে, আমি একটু বাথরুমটা ঘুরে আসি। কেমন?”

“আসুন। আমি স্টেশন থেকে টরেটক্কা করে দিয়ে আসছি ততক্ষণ। ”

“পুলিশ ডাকবেন তো।"

“আজ্ঞে হাঁ। ফাইনসহ পুরো ভাড়া না দিতে পারলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতেই হবে।”

“আপনি খুব তেজস্বী লোক দেখছি।”

সতীশ মাথা উঁচু করে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গে বলল, “তা বলতে পারেন। আমরা তিনপুরুষের রেলের চাকুরে। আমাদের বংশে কেউ কখনও কোনও দুনীতির প্রশ্রয় দেয়নি। কর্তব্য যত কঠিন আর নিষ্ঠুরই হোক তা আমরা করবই।”

লোকটা সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, “সে বুঝেছি। তেজস্বী লোকদের জন্যই আজ আমার এই বিপদ। ওই যে গান্ধীজি— উনিও এক তেজস্বী লোক। তাঁর ফেরে পড়েই আজ আমার এই দুর্গতি। দুটাে মিথ্যে কথা কইলে আজ কত সুখে থাকতে পারতুম। তা মশাই, আমি এখন একটু বাথরুমে যাব কি?”

সতীশ বলল, “সে যান। কিন্তু পালানোর চেষ্টা করবেন না। লাখন মস্ত কুস্তিগির, সে আপনার ওপর নজর রাখবে। আর পালালেও বিশেষ সুবিধে হবে না। এখানে নানারকম বিপদ। আপনার নামটি কী বলুন তো, নোট করে রাখি।”

“নাম !" বলে লোকটা ঢোক গিলল, “এই রে ! নামটা যে ভুলে মেরে দিয়েছি।”

সতীশ চোখ কপালে তুলে বলে, “নিজের নাম ভুলে গেছেন। আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই!”

লোকটা সিলিঙের দিকে তাকিয়ে গলা চুলকোতে চুলকোতে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ভাবতে লাগল। ঘন-ঘন মাথা নাড়ল। তারপর চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, “পেটে আসছে, মুখে আসছে না। এত বিপদে কি মাথার ঠিক থাকে! মাথাটা কেমন যেন ফরসা হয়ে গেছে, একেবারে সাদা। তবে নিজের নামটা ভুরভুরি কাটছে ঠিকই। একটু সময় দিন, ঠিক মনে পড়ে যাবে।”

সতীশ মাথা নেড়ে বলে, “ওসব চালাকি আমার ঢের জানা আছে। যে নিজের নাম চাপা দিতে চায় তার ভালরকম গলদ আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি কোনও গুরুতর রকমের অপরাধ করে পালিয়ে এসেছেন । হয়তো খুন, হয়তো ডাকাতি।নাঃ আর দেরি করা ঠিক হবে না । রেল-পুলিশে খবরটা তো আগে দিই, তারপর এখানকার থানাতেও ব্যাপারটা জানাতে হবে।”

এ-কথায় লোকটা খুব অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল, মুখে বাক্য সরল না। শুধু বারকয়েক শুকনো মুখে ঢোক গিলল। মুখখানা এমন করুণ আর ফ্যাকাসে হয়ে গেল যে, সতীশের মতো দৃঢ়চেতা লোক না হয়ে অন্য কেউ হলে সেই করুণ মুখ দেখে হয়তো করুণায় কেঁদেই ফেলত। কিন্তু সতীশ বজ্রকঠিন মানুষ।

অন্যায় সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তার সঙ্গী লাখনও তার মতোই। লাখন কুস্তিগির পালোয়ান এবং পরম রামভক্ত মানুষ। রোজ সে

রামচরিতমানস সুর করে পড়ে, রাম-সীতা এবং বজরঙ্গবলীর পুজো না করে জলগ্রহণ করে না। সে-ও অন্যায়-অধর্ম সইতে পারে না । সুতরাং লোকটার মুখ দেখে কারও তেমন করুণার উদ্রেক হল না।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় বলল, "এরেই কয় মাইনক চিপি। "

সতীশ গলা চড়িয়ে বলল, "কী বললেন? গালমন্দ করছেন নাকি?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে না। গালমন্দ নয়। কথাটা আমার দাদু প্রায়ই বলতেন।"

"কথাটার মানে কী ?"

"আজ্ঞে সেটা আমিও ঠিক জানি না। শুধু জানি মাইনকা চিপি।"

"এটা কি বাঙাল ভাষা?"

"তা হতে পারে " বলে লোকটা চোখ বুজে বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। দীর্ঘশ্বাসই।

সতীশ বেরিয়ে গেলে লোকটা করুণ নয়নে লাখনের দিকে চেয়ে বলে, "লাখনদাদা, আমি একটু বাথরুমের দিকে যেতে পারি?"

"হাঁ, হাঁ, কিউ নেহি? লেখিন ভাগবার কোসিস করবেন না। খবরদার। পুলিশ আসবে, বিচার হোবে, তারপর রামজীর যো হিচ্ছা সো হোবে।"

লোকটা বিগলিত হয়ে মাথা নেড়ে উঠে পড়ল।

রেলের কোয়ার্টারের ভেতরদিকে একটা উঠোন। উঠোনের এককোণে স্নানঘর। উঠোনটা বেশ উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তবে পেছনদিকে জমাদার আসবার একটা দরজা আছে। সেটাতে হুড়কো দেওয়া। লোকটা স্নানঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক রেখে নজর করে দেখল, লাখন দরজায় দাঁড়িয়ে একবার হাই তুলল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে "জয় বজরঙ্গবলী" বলে দু-চারবার ডন-বৈঠক করে নিল। এ সময়ে বাইরে থেকে

হঠাৎ হেঁড়ে গলায় কে হাঁক দিল, “এ লাখনভাই, তোহর ভৈঁস কাঁহ ভাগলবা? খোটুয়া উখাড়কে ভাগলবা রে।”

“আয়া রে।” বলে লাখন এক দৌড় মারল।

লোকটা আর দাঁড়াল না। পেছনের দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। কিন্তু মুশকিল হল, লোকটা জীবনে দৌড়ঝাঁপ করেনি, শরীরটাও থলথলে। ফলে দৌড়লেও কোনও লাভ হচ্ছিল না। উপরন্তু লোকটা একটা ছোটখাটো মাঠ পেরোতে গিয়েই ঘেমে, হাঁফিয়ে বেদম হয়ে পড়ল। সারা শরীর ঝনঝন করতে লাগল দৌড়ের ধাক্কায়।

মাঠ পেরিয়েই একটা বাগানওলা পাকাবাড়ি দেখে লোকটা সটান ঢুকে পড়ল। বারান্দায় বসে এক পাকচুলের বুড়ো মানুষ হুঁকো খাচ্ছেন। লোকটাকে দেখে তিনি হঠাৎ অাঁতকে উঠে চেঁচাতে লাগলেন, “ও বাবা, এ যে মস্ত এক কেলে গোরু ঢুকে পড়েছে বাগানে ওরে পন্টু, তাড়া শিগগির গোরুটাকে, সব গাছ খেয়ে ফেলবে… ”

লোকটা আতঙ্কিত হয়ে হাতজোড় করে বলে, “আজ্ঞে আমি গোরু নই। বড় বিপদে পড়ে এসেছি, যদি একটু আশ্রয় দেন।”

বৃদ্ধ হুঁকোটি রেখে ভ্রু কুঁচকে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, “অ, তা ভাল কথা। কিন্তু বাপু, আমার কোদালখানা কি করলে?”

লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে, “কোদাল ! কোদালের কথা উঠছে কেন?"

বুড়ো খাঁক করে উঠলেন, “কোদালের কথা কি আর এমনি ওঠে বাপু! ন্যাকামি কোরো না। পরশুদিন এসে সকালবেলায় তুমি আমার কোদালখানা চালাকি করে নিয়ে যাওনি? খুব তো কোদালখানা একটু দেবেন, ও-বেলা দিয়ে যাব। তা আমিও হরি সামন্ত মনে করে কোদালখানা দিয়ে দিলুম। পরে হরি এসে বলল, সে পরশুদিন এখানে ছিলইনা।”

লোকটা হাতজোড় করেই বলল, "আজ্ঞে আমিও ছিলুম না। আজ সকালেই আমার এখানে প্রথম আগমন হল।"

"বিপদে পড়লে লোকে কত কী বলে, ওসব বিশ্বাস করে আহাম্মকেরা। তোমাকে ঠিকই চিনেছি বাপু, চোখে কম দেখি বলে যে আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে তার জো নেই। পরশু কোদাল নিয়েছ, আজ আবার আশ্রয় না কী যেন নিতে এসেছ, তুমি তো মহা ধুরন্ধর হে ! ওরে পল্টু, শুনছিস। বল্লমখানা নিয়ে আয়, এই কোদালচোর সাঙঘাতিক লোক।"

ভেতর থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, "এই আসছি জ্যাঠামশাই, মুগুরটা আর দশবার ভেঁজেই আসছি। চোরটাকে ধরে রাখো।"

এ-কথা শুনে লোকটা আর দাঁড়াল না। ফটক পেরিয়ে পাই-পাঁই করে ছুটতে লাগল। তবে তার কাছে ছোটাটা পাই-পাঁই মনে হলেও আসলে সে ছুটছিল নিতান্তই থপ-থপ করে, গজকচ্ছপের মতো। বুকে দম নেই, হাঁটু ভেঙে আসছে, তেষ্টায় কণ্ঠা অবধি শুকনো । তবে ভাগ্য ভাল, মুগুরভাঁজা শেষ করে পল্টু এখনও তার পিছু নেয়নি।

তবু সাবধানের মার নেই। লোকটা পথ ছেড়ে পাশের মাঠে নেমে পড়ল। সেখানে দিব্যি বুকসমান উঁচু ধানগাছ। লুকনোর খুব সুবিধে। কোথায় যাবে তারই যখন ঠিক নেই, তখন ধানখেতে ঘুরে বেড়ালেই বা ক্ষতি কী?

এখন শরৎকাল। নীল আকাশে ভোরের সোনার রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। মিঠে হাওয়া দিচ্ছে। পাখি ডাকছে। লোকটার বেশ ভাল লাগতে লাগল। গাঁয়ে-গঞ্জে বড় একটা যায়নি সে। প্রকৃতির শোভা যে এতদূর ভাল তা-ও যেন অজানা ছিল। আহা, কী সুন্দর।

ধানখেতের ভেতরে আলপথ বেয়ে লোকটা খানিকদূর এগোতেই দেখতে পেল দু-চারজন চাষি ধান কাটছে। কাছেই কোনও গ্রাম থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর গরুর হাম্বা রব ভেসে আসছে। লোকটার মন খুব ভাল হয়ে গেল।

গাঁয়ের লোক নিশ্চয়ই খারাপ হবে না। গাঁয়ে যারা থাকে তারা হল গে সহজ-সরল মাটির মানুষ, সাত চড়ে রা কাড়ে না। সেখানে "গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।"

তবে সামনে যে ক'জন চাষিকে দেখা যাচ্ছে তারা কেউ গান গাইছিল না। একদম সামনেই যে চাষিটিকে দেখা যাচ্ছিল, তার মুখখানা ভারী তিরিক্ষে । তা হোক, এরা লোক খারাপ হয় না।

লোকটা যথাসাধ্য হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে গিয়ে বলল, "এই যে ভাই!"

লোকটা ধান কাটতে-কাটতে গোমড়া মুখটা তুলে গুরুগম্ভীর গলায় বলে, "কী চাই?"

বলার ধরনটা ভাল ঠেকল না, লোকটা একটু দমে গিয়ে বলে, "আচ্ছা, এদিকে ভাল লোক কি দু-একজনকে পাওয়া যাবে? বেশ নরম দয়ালু মন, অন্যের দুঃখে প্রাণ কাঁদে, দান করার ঝোঁক আছে, অথচ গায়ের জোর-টোর তেমন নেই– পাওয়া যায় এমন মানুষ?"

চাষিটি কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পাশের খেতের লোকটাকে হাঁক মারল, "ওরে নেতাই, এই সেই লোক।"

নেতাই চেচিয়ে বলল, "কে লোক রে?"

"আরে, গেল বুধবার কুঞ্জখুড়োর বাড়িতে যে ডাকাতি হল মনে নেই? সেই দলে ছিল। মুখে ভুসোকালি মাখা ছিল, তবু ঠিক চিনেছি। এ সেই দলের লোক।"

লোকটা হাঁ-হাঁ করে উঠল, "না, না, কোথাও খুব ভুল হচ্ছে— খুব ভুল করছেন আপনারা—"

ততক্ষণে দুই চাষি কাস্তে হাতে তেড়ে এল। লোকটা ফের পাই-পাই করে ছুটতে লাগল। সে যা ছুট তাতে যে-কেউ একটু পা চালিয়ে হেঁটেই ধরে ফেলতে

পারত তাকে। কিন্তু কপালটা ভালই, মাঝখানে একটা জলের নালা থাকায় লোক দুটাে চট করে কাছে চলে আসতে পারল না। নালাটা পেরোতে একটু ঘুরপথে আসতে হল। ততক্ষণে লোকটা ধানখেত পার হয়ে একটা জঙ্গলের ধারে পৌঁছে গেছে।

জঙ্গলে সাপ আছে কি বাঘ আছে সে বিচার করার সময় নেই। লোকটা হাঁফাতে-হাঁফাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বেশ নিবিড় অন্ধকার জঙ্গল। ঘন গাছপালা, লতা, ঝোপ সব রয়েছে। গা-ঢাকা দেওয়ার পক্ষে চমৎকার। লোকটা জঙ্গলে ঢুকে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাতে-হাঁফাতে কোমরে হাত দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইল। আর চলবার ক্ষমতা নেই।

জঙ্গলের বাইরে সেই হেঁড়ে গলাটা শোনা গেল, "ওরে নেতাই, ডাকাতটা যে মনসাপোঁতার জঙ্গলে ঢুকে গেল!"

নেতাই খুব আহ্লাদের গলায় বলে, "ভালই হয়েছে রে জগা। ডাকাত ধরলে আমাদেরই ভয় ছিল। ওর দল এসে আমাদের কেটে ফেলত। তার চেয়ে মনসাপোঁতার ব্রহ্মদত্যিই নিকেশ করবে ওকে। হুঁ-হুঁ বাছাধন, এবার যাবে কোথায়?"

জগাও বেশ প্রফুল্ল গলায় বলল, "আর ব্রহ্মদত্যিই বা একা কেন? শুখানালার বুনো কুকুরগুলোও রয়েছে। দেখতে পেলেই ছিড়ে খাবে।"

এইসব বলাবলি করতে-করতে দুজনে চলে গেল। লোকটা সভয়ে নিজের চারদিকটা দেখল ভাল করে। বিশাল বড়-বড় গাছ চারদিকে। শাল-সেগুনই হবে। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড় আর লতাপাতায় চারদিকটা দুর্ভেদ্য হয়ে আছে।

লোকটা একটা বড় গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছল। তারপর নিজের বর্তমান অবস্থাটা গম্ভীর মুখে বিচার করতে লাগল। যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে এ-জঙ্গল থেকে চট করে বেরনো ঠিক হবে না। অথচ খিদে-তেষ্টা আছে, ঘুম আছে, স্নানটান করাও আছে, এ-জঙ্গলে কীভাবে

সেসবের ব্যবস্থা হবে সেটাও চিন্তার বিষয়। তার ওপর ব্রহ্মদৈত্য এবং বুনো কুকুরের কথাও শোনা গেল। গতিক মোটেই সুবিধের ঠেকছে না তার কাছে।

হাত চার-পাঁচ দূরে শুকনো পাতায় একটা সরসর শব্দ হল। লোকটা সেদিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। একটা হাত-তিনেক লম্বা গোখরো সাপ হিলহিল করে একটা গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। ওপরেও একটা শব্দ হল। লোকটা তাকিয়ে দেখে, একটা মস্ত বানর ডালে বসে সবেগে পেট চুলকোচ্ছে ।

“নাঃ, প্রাণটা দেখছি বেঘোরেই যাবে!" বলে লোকটা শ্রান্ত শরীরে হেদিয়ে বসে রইল। “সত্য জয়তে" কথাটার মানেই হয় না। সত্যি কথা বলার গুনাগার যা দিতে হচ্ছে তা কহতব্য নয়।

বসে থাকতে-থাকতে লোকটার চোখ ঘুমে ঢুলে আসতে লাগল। সারারাত উদ্বেগ-অশান্তিতে তার ঘুম হয়নি। তার ওপর সকাল থেকে বিস্তর দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। চারদিকে বিপদ জেনেও লোকটা ঢুলতে ঢুলতে গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দুপুর। বেশ চনচনে খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড জলতেষ্টা। জঙ্গলের মধ্যে রোদের চিকড়িমিকড়ি এসে পড়েছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

লোকটা চারদিকে চেয়ে ফের নিজের অবস্থাটা বিচার করে দেখল। খুবই খারাপ অবস্থা । নোংরা জামাকাপড় বদলানোর উপায় নেই। খাদ্য পানীয় নেই। বিছানা নেই। জঙ্গলের বাইরে অনেক শত্রু। জঙ্গলের মধ্যেও বন্ধু কেউ নেই।

তবে একটা ভাল ব্যাপার। লোকটার হঠাৎ নিজের নামটা মনে পড়ে গেল। লোকটার নাম অভয় সরকার।

***************

চক্রপুরের দারোগাবাবুকে দেখলে যে-কারও শ্রদ্ধা হবে। হ্যাঁ, শ্রদ্ধা করার মতোই চেহারা । যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া এবং তেমনই দশাসই। যখন শ্বাস ফেলেন তখন মোষও লজ্জা পায়। ইদানীং ভুড়িটা বড্ড ঝুলে পড়েছে আর গলার নীচেও থাক-থাক চর্বি জমেছে বটে, কিন্তু এখনও একটু কষ্ট করলে ছোটখাটো একখানা খাসি বা মাঝারি একখানা পাঁঠার মাংস একাই সাবাড় করতে পারেন। অবশ্য তার সঙ্গে লুচি বা পরোটা থাকা চাই। শেষ পাতে একটু ক্ষীর দুবেলাই চাই। দিনের বেলা চারটি ভাতই খান বটে, তবে চার হাতা ভাত হলে দু হাতা ঘি লাগে। তা এ-সবের জন্য তাঁকে তেমন ভাবতে হয় না। দারোগাবাবু টিকে আছেন বলে গোটা এলাকাই টিকে আছে। লোকে তাই কৃতজ্ঞতাবশে এ-সবই জোগান দেয়। দারোগীবাবু খাবেন, এর চেয়ে আহ্লাদের ব্যাপার আর কী আছে?

আজ সকালবেলাতেই নেতাই আর জগা এসে হাজির। দুজনেই একসঙ্গে হাতজোড় করে বলল, “বড়বাবু, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। কুঞ্জখুড়োর বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছিল তাদেরই একজন মনসাপোঁতার জঙ্গলে সেঁধোলো। অবশ্য এমনি সেঁধোয়নি, এমন তাড়া করেছিলুম যে, বাছাধন আর পালানোর পথ পায়নি।”

দারোগাবাবু, অথাৎ সুদর্শন হালদার গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে কোয়াটারের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিলেন। কথাটা শুনে কোনও ভাবান্তর হল না। শুধু বললেন, “হুঁ।”

“আজ্ঞে আমরা হলুম তো মনসাপোঁতার জগা আর নেতাই। আমাদের কথাটা একটু মনে রাখবেন।”

সুদর্শনবাবু নিমীলিত নয়নে তাদের দিকে চেয়ে বললেন, “কেন, তোদের কথা আবার মনে রাখতে হবে কেন?”

নেতাই মাথা চুলকে একটু ফিচিক হাসি হেসে বলল, "কথাটা তা হলে খুলেই বলি বড়বাবু। কুঞ্জখুড়োকে তো চেনেন, সাতটা গাঁ মিলেও অতবড় বন্ধকি কারবার আর কারও নেই। সোনাদানা হীরে জহরত দাঁড়া দোনলা। ওঁর মক্কেলরা সবাই টাকার কুমির। ডাকাতরা এসে সেইসব গচ্ছিত জিনিস চেছেপুছে নিয়ে গেছে। কুঞ্জখুড়োর একটা মস্ত দোষ হল, সরকারবাহাদুরের ওপর একেবারেই ভরসা নেই। তাই ঠিক করেছেন ডাকাতদের হদিস যে দিতে পারবে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাইজ দেবেন।"

সুদর্শনবাবু সবেগে সোজা হয়ে বসে বললেন, "কত টাকা বললি?"

"আজ্ঞে পঞ্চাশ আছে আপাতত, তবে ওটা দু-একদিনের মধ্যেই লাখে উঠে যাবে মনে হয়।"

"কই, আমি তো প্রাইজের কথা শুনিনি।"

"আজ্ঞে ছোট মুখের কথা তো, এখনও বড় কান অবধি পৌঁছয়নি। তবে ভাববেন না, কুঞ্জখুড়ো গাঁময় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। যে ধরবে সে পুলিশই হোক আর পাবলিকই হোক, পঞ্চাশ হাজার থোক পাবে। তাই বলছিলুম, আমাদের কথাটা একটু মনে রাখবেন। নিজের চোখে দেখা, ডাকাতটা মনসাপোঁতার জঙ্গলে ঢুকেছে।"

দারোগাবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, "কিন্তু সেই জঙ্গলটা তো ভাল নয় রে।"

নেতাই ঘাড় নেড়ে বলে, "আজ্ঞে না। ব্রক্ষ্মদত্যির বাস তো আছেই, তার ওপর বুনো কুকুরেরও উৎপাত।"

"ডাকাতটার চেহারা কেমন?"

"আজ্ঞে ডাকাতের মতোই। মোটাসোটা, কালো, রক্তবর্ণ চোখ। ও ভুল হওয়ার জো নেই।"

সুদর্শনবাবু চিন্তিত মুখেই বললেন, "তোদের চক্রপুর তো ক্রমে-ক্রমে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে দেখছি। এই তো কিছুক্ষণ আগে স্টেশনমাস্টার সতীশ আর তার স্যাঙাৎ এসে নালিশ করে গেল, কে একটা লোক নাকি ট্রেন থেকে জিনিসপত্র চুরি করে নেমে পড়েছিল। রেল-পুলিশ বলেছে লোকটা স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে যাওয়ায় তারা আর কিছু করতে পারবে না। এখন আমার যত দায়। আবার একটু আগে ফণিবাবুর নাতি পটু এসে বলে গেল, কে নাকি তাদের বাড়ি থেকে ক'দিন আগে কোদাল চুরি করে নিয়ে গেছে, আজ সকালে নাকি আবার আশ্রয় চুরি করতে এসেছিল। অবশ্য আশ্রয় কী জিনিস তা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু এ তো দেখছি চোর-ছাঁচড়-ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল ! অ্যাঁ।"

নেতাই গদগদ হয়ে বলে, "সে সত্যি কথা, তবে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো আপনিও তো আছেন, আর সেইটেই আমাদের ভরসা। পঞ্চাশ হাজারের পঞ্চাশও যদি পাই তবে গোয়ালঘরটা ছাইতে পারি, একজোড়া লাঙলের ফালও কেনা বড় দরকার।"

সুদর্শনবাবু বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, "এখন বাড়ি যা তো বাপু। আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবতে দে।"

দুজনে বিদেয় হলে সুদর্শনবাবু উঠে তাঁর পুলিশের পোশাক পরে নিলেন। তারপর কোমরে রিভলভার এঁটে থানায় রওনা দিলেন।

থানা থেকে গোটাচারেক সেপাই সঙ্গে নিয়ে সুদর্শনবাবু মনসাপোঁতার জঙ্গলের ধারে যখন এসে পৌঁছলেন তখন বেশ বেলা হয়েছে, রোদ চড়েছে এবং খিদেও পেয়েছে। খিদে পেলে সুদর্শনবাবুর মাথার ঠিক থাকে না।

জঙ্গলের দিকে মুখ করে মুখের দুধারে হাত দিয়ে চোঙার মতো করে সুদর্শনবাবু একখানা পিলে-চমকানো হাঁক দিলেন, "ওরে, জঙ্গলের মধ্যে কে আছিস? যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো বেরিয়ে আয়। নইলে রক্ষে থাকবে না কিন্তু!"

কেউ সাড়া দিল না ।

সুদর্শনবাবুর গলা আরও চড়ল, “বলি শুনতে পাচ্ছিস? ধরা না দিলে কিন্তু আমি ফোর্স নিয়ে জঙ্গলে ঢুকব। খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু তখন! একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে। ভাল চাস তো লক্ষ্মী ছেলের মতো দুটো হাত গৌরাঙ্গের মতো ওপরপানে তুলে বেরিয়ে আয়।”

কেউ এল না ।

সুদর্শনবাবু এবার গলা আরও ওপরে তোলার চেষ্টা করলেন, “ভাবছিস জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে বেঁচে যাবি? জানিস এ-জঙ্গলে জয়রাম বেহ্মদত্যি থাকে? জানিস বুনো কুকুরদের কথা? তা ছাড়া সাপ-খোপ আছে, বাঘ-সিংহও থাকতে পারে। বিপদে পড়লে কিন্তু জানি না বাপু। কাজ কি তোর অত বিপদ মাথায় করে জঙ্গলে থাকার? থানায় ভাল বিছানা আছে, গায়ের কম্বল পাবি, চারবেলা মিনি-মাগনা খাওয়া— জঙ্গলের চেয়ে ঢের ভাল। বলছি গুটিগুটি বেরিয়ে আয়। মারধর করব না রে বাপ, আমরা সেরকম লোকই নই।”

কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না ।

সোজা আঙুলে যে ঘি উঠবে না এটা বুঝতে সুদর্শনবাবু একটু ফাঁপরে পড়লেন। কারণ বাঁকা আঙুলে ঘি তোলা কঠিন ব্যাপার। মনসাপোঁতার জঙ্গলে কেউ ঢুকবে না। তবু তিনি সেপাইদের দিকে রক্তচক্ষুতে চেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, “জঙ্গলে ঢুকতে হবে। লোকটা ভেতরেই আছে।”

চারজন সেপাই সঙ্গে-সঙ্গে চার হাত পিছিয়ে গেল। রামরিখ সিং বলল, “হুজুর, চাকরি যায় সে ভি আচ্ছা। দেশে ফিরে গিয়ে মকাইকা খেতি করব। লেকিন মনসাপোঁতায় ঘুসব না।”

অন্য সেপাইদেরও প্রায় একই কথা। চাকরি গেলে তাদের একজন ভিক্ষে করতেও রাজি, আর-একজন পানের দোকান দিতে চাইল এবং চতুর্থজন সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখাল।

মনসাপোঁতার জঙ্গল সম্পর্কে মানুষের ভয় অকারণে নয়। রাত্রিবেলা এই জঙ্গলে ভুতুড়ে আলো দেখা যায়, শোনা যায় নানারকম ভুতুড়ে শব্দও ! দিনের বেলা আগে কাঠ কুড়োতে বা গাছ থেকে বুনো ফলপাকুড় সংগ্রহ করতে অনেকে ঢুকত। ইদানীং আর কেউ যায় না। কারণ আজকাল জঙ্গলে ঢুকলেই পেছন থেকে কে যেন আক্রমণ করে। পাথরের টুকরো বা ডাণ্ডা দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে দেয়। তারপর টেনে জঙ্গলের বাইরে ফেলে দিয়ে যায়। জঙ্গলের ধারে যে অশ্বত্থ গাছটা আছে তার তলায় জবাফুল, কড়ি, জীবজন্তুর মাথা, হাড়গোড় ইত্যাদিও প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এইসব কারণে মনসাপোঁতা এখন সকলের কাছেই নিষিদ্ধ জায়গা।

সুদর্শনবাবু তা ভালই জানেন। ঢুকতে হলে তাঁকে একই ঢুকতে হবে। কিন্তু সেটা কেন যেন সাহসে কুলোচ্ছে না। তাঁর ইচ্ছে, সেপাইদের জঙ্গলে পাঠিয়ে তিনি বাইরে ওত পেতে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছে পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তা বলে পঞ্চাশ হাজার টাকার কথাই বা তিনি ভোলেন কী করে? বেজার মুখ করে তিনি সেপাইদের বললেন, "ঠিক আছে, প্রত্যেকে দশ-দশ টাকা করে পাবি।"

সেপাইদের পায়ে তবু যেন পাথর বাঁধা। সুদর্শনবাবু গলাখাকারি দিয়ে বললেন, "আচ্ছা যা, পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।"

রামরিখ হাতজোড় করে বলল, "রূপাইয়া দিয়ে কী হোবে বড়বাবু? জান না বাঁচলে রূপাইয়া দিয়ে কোন কাম হোবে?"

ঠিক এই সময়ে একটা মস্ত পাথর জঙ্গলের ভেতর থেকে প্রচণ্ড জোরে এসে অশ্বত্থ গাছটার গায়ে লাগল। সবাই আঁতকে উঠল এই আচমকা ঘটনায়। কিন্তু তারপরই একের পর এক পাথর উড়ে আসতে লাগল।

"বাপরে !" বলে সেপাইরা উল্টোদিকে দৌড় দিল।

বললেন, "সাবধান বলছি ! খবরদার, ঢিল ছুড়বি না, গুলি করব।"

জঙ্গলের মধ্যে কে যেন হিঃ হিঃ করে রক্তজল-করা হাসি হেসে উঠল।

সুদর্শনবাবু আর দাঁড়ালেন না। সেপাইদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনিও ছুটতে লাগলেন।

সন্ধেবেলার আপ ট্রেন থেকে চক্রপুর রেল স্টেশনে চারটে লোক নামল। চারজনের চেহারাই বেশ লম্বা-চওড়া মজবুত। সঙ্গে মালপত্র বিশেষ নেই, শুধু একটা করে সুটকেস।

চক্রপুরে এরা যে নতুন তা বুঝতে পেরে ট্রেনটা পাস করিয়ে সতীশ এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

চারজনের একজন অন্য সকলের চেয়ে একটু বেশি লম্বা এবং চওড়াও। লোকটা সতীশের দিকে চেয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলে, "আমরা একটা তদন্তে এসেছি।"

"তদন্তে? আপনারা কি পুলিশের লোক?"

"হ্যাঁ। আমরা গোয়েন্দা।"

সতীশ সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশ-মিলিটারি দেখলে খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আসুন, আসুন, স্টেশনঘরে একটু বসুন। চক্রপুরে হঠাৎ গোয়েন্দা-পুলিশের আগমন হল কেন সেটা একটু শুনি।"

এ-প্রস্তাবে লোকগুলোর তেমন আপত্তি হল না। স্টেশনের ছোট ঘরে এসে চারজন যখন কাঠের বেঞ্চটায় বসল তখন কেরোসিনের আলোয় চারজনের চেহারা একটু পরিষ্কার দেখতে পেল সতীশ। সত্যি কথা বলতে কি, চারজনের চেহারাই একটু যেন অস্বস্তিকর। একজনের কপালে একটা বেশ গভীর কাটা দাগ আছে। একজনের নাক ভাঙা। তৃতীয়জনের একটা চোখ কানা। চতুর্থজনের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নেই।

এদের সর্দার বলে যাকে মনে হচ্ছিল সেই লম্বা-চওড়া লোকটা সতীশের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা একজন ভয়ঙ্কর অপরাধীর খোঁজে এখানে এসেছি। লোকটা কয়েকদিন আগে একটা খুন করে পালিয়ে এসেছে। আমরা খবর রাখি, সে এদিকেই এসেছে। সম্ভবত এখানেই কোথাও তার পৈতৃক বাড়ি ছিল।"

সতীশ তটস্থ হয়ে বলে, "লোকটার চেহারা কেমন বলুন তো ! কালো মতো? একটু থলথলে? মুখে একটা ভালমানুষী ভাব?"

চারজন নিজেদের মধ্যে একটু দৃষ্টি-বিনিময় করে নিয়ে বলল, "ঠিক মিলে গেছে। লোকটার চেহারা দেখে ভুল বুঝবেন না। সে মোটেই ভালমানুষ নয়।"

সতীশ মাথা নেড়ে বলে, "সে আমি খুব জানি। লোকটা অন্যের মাল চুরি করে পালাচ্ছিল। টিকিটও ছিল না। পরে শোনা গেছে সে কোনও ডাকাতের দলেও ছিল।"

"অতি সত্যি কথা। এখন প্রশ্ন হল, লোকটা কোথায়?"

"লোকটা পালিয়েছে। যতদূর মনে হয় মনসাপোঁতার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। তবে ভাববেন না, মনসাপোঁতায় একবার ঢুকলে কারও নিস্তার নেই। ভয়ঙ্কর জায়গা।"

লোকটা বলল, "যত ভয়ঙ্কর জায়গাই হোক, লোকটাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। মনসাপোঁতা কোনদিকে?"

"সে অনেকটা দূর। রাতে সেখানে যেতে পারবেন না।"

"আমরা সকালেই রওনা হব। আজ রাতটা আমরা এই স্টেশনঘরেই কাটাতে চাই। আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।"

সতীশ মাথা নেড়ে বলল, "না, আপত্তি কিসের? কিছু রুটি-তরকারি পাঠিয়ে দেব'খন।"

"তা হলে তো চমৎকার।" এই বলে লোকটা হাত বাড়িয়ে সতীশের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধুত্ব প্রকাশ করে বলল, "আমার নাম তিনু সেন। আর এরা হল পচা, ল্যাংড়া আর সন্তু।"

হাতখানায় ঝাঁকুনি খেয়েই সতীশ বুঝে গিয়েছিল, তিনু সেন খুব শক্ত ধাতের লোক। সতীশের হাতটা যে ছিড়ে গেল না সেটাই ভাগ্যের কথা। গোয়েন্দা-পুলিশ হলেও লোকগুলোর হাবভাব তেমন সুবিধের ঠেকছিল না তার। চোখগুলো যেন বড্ড জ্বলজ্বল করছে।

সতীশ টেবিলের কাগজপত্র একটু তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে রেখে বলল, "তা হলে আমি এখন আসি? পোটার লাখন একটু বাদে আপনাদের খাবার দিয়ে যাবে'খন।"

তিনু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে থানা-টানা আছে?"

"আছে। কেন, সেখানে খবর পাঠাতে হবে? কাল সকালেই লাখনকে পাঠিয়ে দিতে পারি দারোগাবাবুর কাছে।"

তিনু মাথা নেড়ে বলে, "তার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে আমরাই যাব। আপাতত আমরা লোকাল পুলিশের সঙ্গে ইনভলভড হতে চাই না।"

"ঠিক আছে।" বলে সতীশ তাড়াতাড়ি কোয়াটারে ফিরে এল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এই চারজন গোয়েন্দা-পুলিশের কথা সুদর্শন দারোগাকে জানানো দরকার।

রাত্রিবেলা লাখন রুটি-তরকারি পৌঁছে দিতে গিয়ে খুব গণ্ডগোলে পড়ে গেল। স্টেশনের ঘরে চারটে তাগড়াই লোক কেরোসিনের বাতির আলোয় জাম্বুবানের মতো বসে আছে। একজন নিবিষ্ট মনে টেবিলের ওপর চারটে পিস্তল পর পর সাজিয়ে রেখে সযত্নে গুলি ভরছে। অন্য একজন বেশ তেজী গলায় বলছে, "অভয় সরকার মাস্ট বি কিলড। কোনওভাবে যেন পুলিশ ওর নাগাল না

পায়। তার জন্য দরকার হলে আরও দু-চারটে লাশ ফেলে দিতে হবে। যদি কেউ ওকে প্রোটেক্ট করতে চায়।”

লাখন ইংরেজি এবং বাংলা দুটোই কিছু কিছু বোঝে। পিস্তল দেখে এবং কথাবার্তা শুনে কুস্তিগির লাখনেরও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

যে-লোকটা কথা বলছিল সে লাখনকে হঠাৎ দরজায় উদয় হতে দেখে কথা থামিয়ে বাজখাই গলায় বলে উঠল, “তুই কে রে?”

পিস্তলওলা লোকটা ধাঁ করে একটা পিস্তল তুলে তাক করে বলল, “হ্যান্ডস আপ।”

লাখন কথাটা বুঝল, তবে হাত তোলার উপায় ছিল না। এক হাতে টিফিনবাটিতে রুটি, অন্য হাতে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে তার তৈরি বিখ্যাত আলুর তরকারি। সে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, “আমি লাখন আছি বাবুজি। পোটার লাখন। আপলোগকা খানা লায়া।”

“অ!” বলে প্রথম লোকটা যেন খুব তাচ্ছিল্য করে বলল, “ওই টেবিলে রেখে যা, আর শোন, খবরদার সাড়াশব্দ না করে এ-ঘরে কখনও আসবি না। একেবারে জানে মেরে দেব।”

লাখন এত কাঁপছিল যে, হাত থেকে বাটি-টাটি পড়েই যেত। কোনওরকমে টেবিলে নামিয়ে রেখে সে প্রাণভয়ে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিস্তলওলা লোকটা উঠে এসে প্ল্যাটফর্মে তার পথ আটকাল,“এই, তুই আমাদের কথা কিছু শুনতে পেয়েছিস?”

“নেহি বাবু, রাম কি কিরিয়া।”

“যদি শুনে থাকিস তো ভুলে যা। মুখ দিয়ে যদি টু শব্দটি বেরোয় তা হলে কিন্তু খুন হয়ে যাবি। মনে থাকবে?”

“জি বাবু।”

“এখানকার থানাটা কোথায়?”

"আধা মিল দূর হাোবে। হুই দিকে।"

"দারোগা কেমন লোক?"

"ভাল লোক আছে বাবুজি।"

"ভাল মানে কি? চালাক-চতুর, না বুদ্ধ?"

কোনটা বলা ঠিক হবে, তা বুঝতে না পেরে লাখন একটু মাথা চুলকোল। তার মনে হল দারোগাবাবু বোকা হলেই এদের সুবিধে। সে বলল, "বড়বাবু বুদ্ধ আছে।"

"আর তুই! তুই চালাক, না বুদ্ধ?"

"আমি-ভি বুদ্ধ আছে।"

"তোর চেহারাটা ভাল। কুস্তিটুস্তি করিস নাকি?"

"থোড়া থোড়া।"

একদিন কুস্তি হয়ে যাবে।"

লাখন ভয় পেয়ে বলল, "নেহি হুজুর, হামি তো হারিয়ে যাব।"

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, "লড়ার আগেই হেরে বসে আছিস ! ঠিক আছে, তা হলে তোকে কুস্তির কয়েকটা প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়ে যাব।"

"জি হুজুর মেহেরবান।"

"আর শোন, ওই স্টেশন-মাস্টারটা কেমন লোক?"

"ভাল আদমি বাবুজি।"

"তোর কাছে দেখছি সবাই ভাল! এ-লোকটা চালাক, না বোকা? সাহসী, না ভিতু?"

"ভিতু আছে, একটু বুদ্ধ-ভি আছে।"

"দরকার পড়লে বোকা সাজতে পারে তো! তা হলেই হবে। এখন যা।"

****************

অভয়ের ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধে। ঘুমের ঘোরে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিক চেয়ে হাঁ হয়ে গেল। এখানে যে কি করে এল, কেন এল তা ঘুমজড়ানো চোখে প্রথমটায় কিছুতেই বুঝতে পারল না। তারপর হঠাৎ ঝাঁ করে সব মনে পড়ে গেল। আতঙ্কিত চোখে চারদিকে চাইল সে। চারদিকে ধীরে-ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। মিটমিট করছে জোনাকি পোকা।

অভয় টের পেল তার যেমন প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে তেমনই দাউ-দাউ খিদে। ছোটখাটো খিদেই অভয়ের সহ্য হয় না, আর এ তো বড় খিদে। এই জঙ্গলের মধ্যে খিদেতেষ্টা কোনওটারই কোনও সমাধান পাওয়া যাবে বলে ভরসা হল না অভয়ের। তার ওপর অন্ধকার হয়ে আসছে। একঝাঁক শেয়ালও কাছেপিঠে ডেকে উঠল।

এরকম গা-ছমছমে পরিস্থিতিতে কখনও পড়তে হয়নি অভয়কে। সে শহুরে মানুষ। সে জন্তু-জানোয়ার, সাপ-বিছে, ভূত-প্রেত ইত্যাদিকে ভীষণ ভয় খায়। এই জঙ্গলে যদি রাত কাটাতে হয় তা হলে ভয়েই মরে যাবে অভয়।

সে টপ করে উঠে পড়ল। এবং উঠতে গিয়েই টের পেল তার সবাঙ্গে হাজারটা বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। অভয় জীবনে কখনও দৌড়ঝাঁপ করেনি, ব্যায়াম করেনি, তার থলথলে আদুরে শরীর।

সেই শরীর নিয়ে আজ সকালে যে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে তাতে যন্ত্রণা তো তুচ্ছ, মরেই যাওয়ার কথা।

হাঁটতে গিয়ে দেখল, মাথায় খচখচ করে এমন ব্যথা উঠছে যে, দুপা হাঁটতে গেলে তিন মিনিট দম নিতে হয়। কিন্তু প্রাণের ভয় বড় ভয়। অভয় তার শরীরটাকে একরকম টানতে-টানতে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে চলতে লাগল। জঙ্গলের বেশি ভেতরে সে ঢোকেনি, বাইরেটা দেখাও যাচ্ছে। অভয় সুতরাং খুব উৎসাহ নিয়ে পায়ে-পায়ে এগোতে লাগল। কাছেই গ্রাম আছে, সেখানে গিয়ে পড়লে লোকে বোধ হয় ফেলবে না।

বাইরে বেরিয়ে এসে অভয় একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। সামনেই একটা অশ্বত্থ গাছ। তার পাশ দিয়ে আবছা অন্ধকারেও একটা পায়ে-হাঁটা পথ দেখা যাচ্ছে। ও পথ ধরে একটু এগোলেই গ্রাম।

অভয় প্রাণপণে এগোতে লাগল। শরীরের ব্যথা আর হাঁটার ধকলে এই শীতেও তার ঘাম হতে লাগল। হাঁফ ধরে গেল। মাথা ভোঁ-ভোঁ করে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

তবু হাল ছাড়ল না অভয়। পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাতে কোনওরকমে এখন তাকে লোকালয়ে পৌঁছতেই হবে।

একটা বাঁশবন পেরিয়ে রাস্তাটা একটা বাঁক খেয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকেছে। হ্যারিকেন বা কুপির আলো দেখা যাচ্ছে এদিক-সেদিক। বাচ্চাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গোরুর গলার ঘণ্টা বাজছে। একটা ছাগলও যেন ম্যা করে উঠল। এসব শুনে আর দেখে ভারী ভাল লাগতে লাগল অভয়ের।

একটা লোক দুটো বলদ তাড়িয়ে ফিরছিল, কাঁধে লাঙল, অভয় তার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "আচ্ছা ভাই, এ-গাঁয়ের মোড়ল-মশাইয়ের বাড়িটা কোনদিকে?"

লোকটা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, “এ-গাঁয়ে সবাই মোড়ল। তা মোড়লকে কিসের দরকার আপনার?”

অভয় কাঁচুমাচু হয়ে বলল, “এ-গাঁয়ের খুব নাম শুনেছি কিনা, তাই দেখতে আসা।”

লোকটা বলদের লেজে একটা মোচড় দিয়ে জিভে একটা বিকট ট-ডু-ডু-ডু আওয়াজ তুলে অভয়কে খুব চমকে দিল। তারপর খুব অবাক হয়ে বলল, “এ-গাঁয়ের নাম শুনেছেন ! এমন আশ্চর্য কথা আর কারও মুখে জন্মে শুনিনি। তা এ-গাঁয়ের নামটি কী বলুন তো !”

অভয় নামটা সকালে বোধ হয় একবার শুনেছিল। কিন্তু এখন তার মাথা বেবাক ফরসা। কিছুই মনে নেই। সে আমতা-আমতা করে বলল, “খুবই ভাল নাম আপনাদের গাঁয়ের। কিন্তু নামটা আমার পেটে আসছে, মুখে আসছে না।”

“অ! তা ভাল। এই গাঁয়েই কি আজ দেহরক্ষা করার ইচ্ছে?”

অভয় আঁতকে উঠে বলে, “তার মানে?”

“বলছি এ-গাঁয়েই কি রাতটা কাটাবেন?”

“তা বটে। কিন্তু দেহরক্ষা করার কথা বলছেন কেন? দেহরক্ষা মানে তো পটল তোলা!"

লোকটা এবার অন্ধকারেও সাদা দাঁত দেখিয়ে এক পলক হেসে বলে, “ওই হল। আমরা মুখ-সুখ মানুষ, কত ভুলভাল বলি। একটু ঘষেমেজে নেবেন। তা আপনার কোনও অসুবিধে হবে না এখানে। দিব্যি থাকবেন।”

অভয় আশার আলো দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, “আঃ, বাঁচালেন। আজ বড় ধকল গেছে কিনা। খিদেতেষ্টায় প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত।”

লোকটা ফ্যাচ করে হেসে বলে, “তা আপনাকে ন্যাংচাতে দেখেই বুঝেছি। ধকলটা গেল কিসে? কেউ তাড়াটাড়া করেছিল নাকি?”

"যা বলেছেন। এখানকার লোকগুলো যেন কেমনধারা। সত্যি কথা বললেও বিশ্বাস করতে চায় না।"

লোকটা খুব বুঝদারের মতো বলে, "কথাটা সত্যি, এদিককার লোক বিশেষ সুবিধের নয়। তবে আর চিন্তা নেই, আপনি ঠিক জায়গাটিতেই এসে পড়েছেন। একেবারে সিংহের গুহায়।"

লোকটা ফের ফ্যাচ করে হেসে বলে, "মুখ-সুখ মানুষ আমরা কী বলতে কী বলে ফেলেছি। ওসব ধরবেন না। আমরা খুব যত্নআত্তি করব আপনার, কিছু ভাবতে হবে না। আমরা একটু মোটা চালের ভাত খাই। মোটা রাঙা মিঠে ভাত। মোটা চালের ভাত চলবে তো আপনার?"

ভাতের কথায় অভয়ের চোখে জল এল, বলল, "খুব চলবে। কতকাল যে ভাত খাইনি মনে হচ্ছে। সঙ্গে ডাল থাকবে তো!"

লোকটা তেজী গলায় বলে, "থাকবে না মানে? সোনামুগের ডাল একেবারে গরম গরম ঢেলে দেওয়া হবে ভাতের মাথায়। সঙ্গে ফুলকপি ভাজা, মটর শাকের ঘন্ট, মাছের ঝোল, শেষ পাতে গোরুর দুধ, তাতে আবার পুরু সর।"

অভয় যেন নিজের দুই কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।বলল,"অত দরকার নেই।"

"না, না, দরকার থাকবে না কেন? গাঁয়ে এতকাল পরে একজন অতিথি এলেন, তার সৎকার ভালমতো করতে হবে না? কী বলেন?"

'সৎকার শব্দটা খট করে লাগল অভয়ের কানে। তবে সে আর ওটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। সৎকার কথাটার ভাল মানেও আছে। হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের মাঝ বরাবর চলে এল তারা। দুটা পুকুর এবং আর-একটা বাঁশঝাড় পেরোতে হয়েছে। তারপর একটা মস্ত উঠোনওলা বাড়ি। লোকটা আগল ঠেলে বলদ তাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে ফুকতে বলল,"আসুন, আসুন, লজ্জা করবেন না।

এই হল আমার বাড়ি ওরে, অতিথি এসেছে— মহামান্য অতিথি, তোরা একটা মোড়া বা জলচৌকি দে তো। তারপর পাদ্যঅর্ঘ্য দে।”

আপ্যায়নটা বড্ড বাড়াবাড়ি ঠেকছে অভয়ের কাছে। এতটা কেউ করে নাকি?

জলচৌকি, মোড়া বা পাদ্যঅর্ঘ্য কোনওটাই অবশ্য এল না। লোকটা গোয়ালঘরের দিকে যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, “বাবুমশাই ওই দাওয়াতেই একটু চেপে বসুন। আমি বলদ দুটোকে জাবনাটা দিয়েই এলুম বলে। তারপর দেখবেন কেমন যত্নআত্তি করি।”

দাওয়ায় একটা টেমি জ্বলছে। লোকজন বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। তবে দু-একজন মহিলা উঁকিঝুকি দিয়েই আড়ালে সরে গেলেন। রান্নাঘর থেকে ভাত ফুটবার গন্ধ আসছে। ডালে সম্বর দেওয়ারও একটা ছাঁক শব্দ এল। অভয় শরীরের ব্যথা আর ক্লান্তি ভুলে আকুল হয়ে বাতাস শুকতে লাগল। আঃ, কী সুবাস ! পেটে খিদেটাও যেন একেবারে উথলে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকবার পরও লোকটার দেখা পাওয়া গেল না। ভাতের খিদে চাগাড় দিচ্ছে। জলতেষ্টাও আর সহ্য করা যাচ্ছে না। উঠোনের এককোণে ইদারা আর দড়িবাঁধা বালতি দেখতে পেয়ে অভয় নিজেই উঠে গেল। জল তুলে-তুলে প্রাণভরে খেল। জলের যে এত স্বাদ, তা যেন জানা ছিল না এতকাল। মুখে-ঘাড়ে জল দিয়ে বড় আরামও হল। গাঁয়ের লোকেরা সাঁঝরাতেই খেয়ে নেয় বলে সে শুনেছে। তাই আশা হল, এরাও বোধ হয় এখনই খেতে ডাকবে।

দাওয়ায় বসে এসব ভাবতে-ভাবতে ক্লান্তিতে আবার একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল অভয়ের। হঠাৎ একটা প্রবল চিৎকারে চমকে চাইল।

“ওরে। এই তো সেই ! এই তো কুঞ্জখুড়োর বাড়ির সেই ডাকাত ! এই তো আজ সকালে আমাদের তাড়া খেয়ে মনসাপোঁতার জঙ্গলে সিঁধিয়েছিল?”

অভয় অবাক হয়ে দেখল, সামনে তাকে ঘিরে লাঠিসোটা নিয়ে অন্তত চোদ্দ-পনেরো জন লোক। অন্তত চার-পাঁচটা হ্যারিকেন জ্বলছে। একটা মশালও। সামনের ভিড়ে সকালের সেই দুটি চাষিকেও চিনতে পারল অভয়। ভয়ে সে সিটিয়ে গেল।

বাড়ির মালিক একটু ফিচিক হাসি হেসে বলল, "ব্যাটা যখন গাঁয়ের নামটাই বলতে পারল না তখনই বুঝেছি এ-ব্যাটা সাঙঘাতিক লোক। আগেই তোমাদের বলে দিচ্ছি ভাই, কুঞ্জখুড়োর পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আমি বেশি চাইব না, দশটি হাজার কিন্তু আমার চাই। নইলে এ-ডাকাত আমি হাতছাড়া করব না।"

জগা বলল, "ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা পরে হবে। আগে কুঞ্জখুড়োর কাছে খবরটা তো পাঠাতে হয়। নইলে ওই পেটমোটা দারোগা এসে আসামিও নিয়ে যাবে, প্রাইজও।"

নেতাই বলল, "তোরা আহাম্মক আছিস বাপু ওরে, চোরাই মাল উদ্ধার না হলে কুঞ্জখুড়ো ট্যাক থেকে ফস করে টাকাটা দিয়ে ফেলবে ভেবেছিস? এর মুখ থেকে কথা বের করতে হবে না আগে? দলে কে কে ছিল, চোরাই মাল কার কাছে আছে সেসব আগে জেনে নে। তারপর মাল উদ্ধার করে দিতে হবে না? বলি মাথায় আছে সেসব কথা? অক্ষয়, কী বলো হে?"

কথাটা যে ন্যায্য, সেটা সবাই স্বীকার করল। অক্ষয় হল বাড়ির মালিকের নাম। সে বলল, "তোমার কথা কখনও ফেলনা নয়। এখন বাঁশডলা দিয়ে বিছুটি লাগিয়ে এর পেট থেকে কথা বের করতে হবে।"

একজন ভিতু ও সরল গ্রামবাসী বলে উঠল, "ও অক্ষয়দা, এর কাছে আবার অস্তর নেই তো!"

অক্ষয় বলে, "থাকতে পারে। তবে ক'জনকে আর মারবে? বল্লমে গেঁথে ফেলব না ! ওরে ও জগা, দ্যাখ তো কোমরে পিস্তল ভোজালি কিছু আছে কি না।"

ছিল না । থাকার কথাও নয়। জগা হাতিয়ে দেখে নিয়ে বলে, “নেই। বোধ হয় জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে ভয়ে।”

অভয় হঠাৎ বুঝতে পারল, গরম-গরম ডালভাত জোটার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। এবার যা জুটবে তা সইতে পারার ক্ষমতাও তার নেই। সে জীবনে মারধর খায়নি। অভয় তাই আচমকা উঠেই একটা দৌড় লাগাল।

কিন্তু সেটাই ভুল হয়েছিল। এই চক্রবূহ ভেদ করা যে অসাধ্য কাজ তা বুঝতে পারেনি। ছুটতে শুরু করামাত্র দু-তিনটে লাঠি দমাদম তার পিঠে, মাথায় আর কাঁধে এসে পড়তে লাগল। পায়ে লাঠি দিয়েই কে যেন ল্যাং মেরে ফেলে দিল তাকে। আরও দু-চার ঘা পড়তেই চোখ অন্ধকার হয়ে গেল তার।

যখন চোখ মেলল, তখন তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে লোক।

জগা বলল, “কুঞ্জখুড়ো, ভাল করে দ্যাখো, এই লোকটাই কিনা?”

গায়ে তুষের চাদর-জড়ানো আর সাদা গোঁফওলা একটা লোক ঠিকই বাপ। তবে এ কবুল করলে হয়। মাল উদ্ধার না হলে কিন্তু আমি টাকা দিচ্ছি না।”

“উদ্ধার হবে না মানে ! পেট থেকে কী করে কথা বের করতে হয় তা আমরা জানি।”

কুঞ্জখুড়ো ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, “ওরে, আমার চোখের সামনে ওসব আসুরিক কাজ করিস না। ও আমি সইতে পারি না। আমি ধর্মভীরু লোক। আমি বিদেয় হই, তারপর তোরা যা পারিস করিস। তবে কথা আদায় করাই চাই।”

কুঞ্জখুড়ো বিদেয় নিতেই জগা চুলের মুঠি ধরে অভয়কে তুলে পেল্লায় একখানা কিল মারল মুখে, “কী রে হতভাগা, বলবি কিনা?”

অভয়ের ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। জিভে রক্তের নোনতা স্বাদ পেল সে। গায়ে আর একরত্তি জোর নেই। মনে কোনও শক্তি নেই। সে ভ্যাবলার

মতো চেয়ে রইল। কিছু একটা না বললে এরা যে থামবে না এবং মারতে-মারতে মেরেই ফেলবে তাতে তার সন্দেহ নেই। জগা আবার কিল তুলল ওই।

হঠাৎ অভয় হাত তুলে বলল, "বলছি, বলছি।"

"মিছে কথা বোলো না কিন্তু।"

"টাকা আর সোনাদানা পোঁতা আছে শুখানালার সরকারদের বাড়িতে।"

নেতাই অবাক হয়ে বলে, "এসব কী বলে রে ব্যটা?"

অভয় অতশত জানে না। মার ঠেকাতে সে নিজের পৈতৃক বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে।

অক্ষয় খুব ভাবিত মুখে বলে, "শুখানালার সরকার-মশাইদের বাড়ি তো কবে হেজেমজে গেছে। সেখানেই এখন ডাকাতদের আস্তানা ! তা হলে তো ভীম সরকারের গপ্পোটা মিথ্যে হয়ে যায়। ওখানে তো জনমনিষ্যি যেতে পারে না।"

জগাও চিন্তিত মুখে বলে, "সেটাই তো কথা। সরকারবাড়িতে ঢোকা তো আর ফাজলামি নয়।" বলে সে অভয়ের দিকে চেয়ে বলে, "ওরে ও ভূত, সত্যি কথা বলছিস তো ! মিথ্যে বললে কিন্তু বল্লমে গেঁথে জলায় পুঁতে রাখব। বিশ বছরেও কেউ লাশ খুঁজে পাবে না।"

অভয় চিঁচিঁ করে বলল, "আজ্ঞে, সত্যি কথাই বলছি। আমাকে আর মারবেন না। শরীরে আর মার খাওয়ার মতো জায়গা নেই।"

জগা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "আর অন্যদের যখন মারো-কাটো, তখন তাদের শরীরে কী হয় সেটা ভেবে দেখেছ? ডাকাতি করতে গিয়ে যখন ছোরাচুরি গোলাগুলি চালাও, ঘরে আগুন দাও, মেয়েদের কান থেকে দুল ছিড়ে নাও, তখন কী হয়?"

অভয় হাতজোড় করে বলল, "ওসব মহাপাপ।"

নেতাই ফ্যাচ করে হেসে বলল, “ওরে, এর যে ধর্মজ্ঞান হতে লেগেছে। দড়িদড়া নিয়ে এসে পিছমোড়া করে বাঁধ এটাকে থামের সঙ্গে। রেমোটা কোথায় গেল?”

নাপিত রেমো নিবিষ্ট-মনে একধারে বসে ক্ষুর শানাচ্ছিল। গম্ভীর গলায় বলল, “আছি।”

নেতাই বলে, “আর দেরি কেন, দে ডাকাতটার মাথা কামিয়ে।”

রেমো ক্ষুর হাতে এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসল অভয়ের পাশে, বলল, “বাঃ দিব্যি ঢেউ-খেলানো চুল দেখছি। ডাকাত হলে কী হয়, চুলের বাহার আছে।”

অভয় সভয়ে ক্ষুরটার দিকে চেয়ে রইল। চুলে তার খুব পরিপাটি। সেই সাধের চুল এরা কামিয়ে দেবে? অভয় হতাশ হয়ে চোখ বুজে ফেলল। প্রতিবাদ করার বা বাধা দেওয়ার শক্তিটুকু অবধি তার নেই।

রেমো অভয়ের মাথার বাঁদিকটা কামিয়ে দিল শুধু। তারপর বলল, “বাঃ, এবার সবাই দ্যাখো কেমন নতুন রকমের বাহার খুলেছে।”

অভয় ক্লান্তিতে তলিয়ে যেতে-যেতে টের পেল সবাই খুব হাসছে আর আনন্দ করছে। করুক গে, সে আর পারছে না। প্রায় অচৈতন্য অবস্থাতেই সে টের পেল, একটা থামের সঙ্গে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হচ্ছে। এও শুনতে পেল, তাকে নাকি সারারাত জলবিছুটি দিয়ে জাগিয়ে রাখা হবে। কারণ গাঁয়ে অনেকদিন যাত্রা বা কীর্তন বা কবির লড়াই হয়নি। মানুষ বড্ড মনমরা হয়ে আছে। তাই আজ তাকে যন্ত্রণা দিয়ে সবাই সারারাত আনন্দ করবে। জলবিছুটির সঙ্গে গরম কলকে, লোহার শিকের ছাঁকাও দেওয়া হবে। অনেকরকমের আয়োজন হচ্ছে। সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল খেয়েদেয়ে আসতে।

অভয় হাল ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। ঘাড় লটকে সে নিস্তেজ হয়ে ঝুলছিল থামটার সঙ্গে। ঠিক এই সময়ে কে যেন তার কানের কাছে ফিসফিস

করে বলল, "বাঁধন ক্ষুর দিয়ে একটু-একটু কেটে রেখেছি। হ্যাঁচকা টান মারলেই খুলে যাবে, বুঝলে?"

চোখ না চেয়েও অভয় বুঝতে পারল, এ হচ্ছে রেমো নাপিতের গলা। সে অতি কষ্টে ঘাড় নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

পারো তা হলে বেঁচে যাবে। মাইলখানেক যেতে পারলেই শুকনো নালার খাত পেয়ে যাবে। আর শোনো বাপু, হুকুম সিং যে সরকারবাড়িতে আস্তানা গেড়েছে তা তো বলোনি কখনও আমাকে ! এটা খুব অন্যায় কথা। আমি তো জানতুম হুকুম সিং ময়নাগড়ের টিলার পেছনে জঙ্গলে থাকে। ঠিকানা বদলে ফেলেছে তা তো বলেনি আমাকে। আর আমি কিনা বহুকাল ধরে তাকে খবর জোগাচ্ছি, সুলুক-সন্ধান দিচ্ছি কোন বাড়িতে কী আছে আর সে কিনা আমার সঙ্গে বেইমানি শুরু করেছে ! তাকে বোলো এরকম হলে কিন্তু আমি তার হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পারব না।"

অভয় মাথা নেড়ে বলল, "যে আজ্ঞে।"

"তুমি হুকুম সিং-এর লোক বলেই পালাতে দিচ্ছি। এটাও তাকে বোলো। আমি নেমকহারাম নই। তবে হুকুম সিং কাজটা ভাল করছে না। কুঞ্জখুড়োর বাড়ির খবরও তো আমিই দিয়েছিলাম। কয়েক লাখ টাকা লুটে নিয়ে গেল, আর আমাকে কী দিল জানো? মোটে দু হাজার টাকা আর একখানা আংটি। এসব কি তার ধর্মে সইবে?"

অভয় এবার চোখের কোণ দিয়ে চারদিকটা দেখে নিল। উঠোন এখন ফাঁকা। সারারাত মজা দেখবে বলে সবাই ভাত খেতে গেছে। একা রেমো তাকে পাহারা দিচ্ছে।

রেমো তার ক্ষুর-কাঁচির বাক্স গুছিয়ে বন্ধ করে বলল, "ওরা এলেই আমি বাড়ি যাব বলে কথা আছে। কিন্তু লোকজন এসে পড়ার আগেই সরে পড়তে

হবে তোমাকে। অক্ষয় খেতে বসেছে। আমি বরং রান্নাঘরে গিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে একটু জরুরি কথা সারছি, এই ফাঁকে পালিও। বেশি সময় পাবে না কিন্তু।”

অভয় ঘাড় নাড়ল। রেমো শব্দ করে একটা হাই তুলল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, “ও অক্ষয়, মকর নদীর জমিটা কি কিনছো নাকি? মকর একটা খবর পাঠিয়েছে। বলব?”

অক্ষয় ভাতভর্তি মুখেই উঁচু গলায় বলল, “বলবে না মানে ! কতকাল ধরে জমিটার ওপর নজর আমার ! এসো এসো, খবরটা বলে যাও।”

“যাব তো, কিন্তু ডাকাতটা আবার এই ফাঁকে পালাবে না তো!”

“আরে না। ওর হাড়গোড় কি আর আস্ত রেখেছি নাকি, তার ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। পালাবে না। তুমি এসে খবরটা বলো।”

“যাই।”

বলে যেন অনিচ্ছের সঙ্গেই রেমো উঠে গেল। চাপা গলায় বলে গেল,“এই সুযোগ কিন্তু আর আসবে না।”

সুযোগ বলতে সুযোগ! একেবারে সুবর্ণ সুযোগ। হ্যাঁচকা টান মারলেই বাঁধন খুলে যাবে। কিন্তু হ্যাঁচকা মারবার ক্ষমতাটুকুও যে অভয়ের নেই। তার আদরের শরীরের ওপর দিয়ে আজ যা ঝড় গেল!

বার কয়েক হাঁচকা মারার চেষ্টা করে দেখল অভয়। হচ্ছে না। বরং সেই পরিশ্রমে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু বাঁচতেও তো হবে। হাতে বেশি সময় নেই। দূরে যেন লোকজনের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। কারা আসছে বুঝি !

অভয় প্রাণ হাতে করে শরীরে একটা মোচড় দি । তারপর দুটাে।

তিনবারের বার বাঁধন খুলে সে হড়াস করে পড়ে গেল বারান্দা থেকে উঠোনে। পড়ার ধাক্কাটা সামলে সে আর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল না। হামাগুড়ি দিয়ে কচুবনের দিকে এগোতে লাগল।

চার-পাঁচজন লোক হল্লা করতে করতে উঠোনে ঢুকে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখেই অভয়ের শরীরে যেন দুনো বল এল।

প্রবল বেগে হামা দিতে-দিতে সে কচুবনে ঢুকে পড়ল, তারপর উঠে দাঁড়াল। রেমো পথের কথা বলেছিল, কোথায় পথ? সামনে বুকসমান আগাছ আর অন্ধকার। পথ নয় বটে, তবে বিপদে পড়লে সব আঘাটাই পথ।

অভয় কাঁদছিল, জীবনে এত হেনস্থা, অপমান আর লাঞ্ছনা তাকে কেউ কখনও করেনি। এত মারধর জীবনে খায়নি। এত পরিশ্রমও জীবনে করতে হয়নি। নিজের জন্য আজ তার বড় কষ্ট হচ্ছে। বেঁচে থাকায় আর কী লাভ?

তবু জৈব তাগিদে সে চলতে লাগল। শীত, কুয়াশা, অন্ধকার, জঙ্গল, তবু চোখের জল মুছতে-মুছতে অভয় এগোচ্ছে। দৌড়নের মতো অবস্থা তার নয়। একটু পেছনে দূরে চেঁচামেচি আর ছোটাছুটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠে আগাছার জঙ্গলেও আলোর আভা এনে ফেলল। কিছু মানুষ যে তার খোঁজে পিছু নিয়ে আসছে তাও টের পেল অভয়। কিন্তু তবু তাড়াহুড়ো করল না। যা হওয়ার হবে। মরবে? তা না হয় মেরেই ফেলুক। এর চেয়ে মরাটা আর এমনকী বেশি?

ক্রমে-ক্রমে চারদিকে উঁচু-উঁচু গাছ দেখা দিতে লাগল। অন্ধকার আরও ঘন হতে লাগল। পেছনের কোলাহল থেমে গিয়ে চারদিক ভীষণ নির্জন হয়ে গেল। অভয় বুঝতে পারল যে, আবার মনসাপোঁতার জঙ্গলে ফিরে এসেছে। সভয়ে দাঁড়িয়ে সে চারদিকটা দেখল। অন্ধকার ছাড়া অবশ্য দেখার কিছু নেই। আর কুয়াশাও বড় ঘন। নিজের হাতখানা পর্যন্ত ঠাহর হয় না। রাতচরা একটা পাখি টি-হি-ট করে ডেকে উঠল। শেয়ালের ঝাঁক হাসল তাদের অট্টহাসি। একটা বুনো জানোয়ার খ্যাঁ-খ্যাঁ করে যেন অভয়কেই ভাঙাল !

অভয় সামনের দিকে পা বাড়াতেই চমকে উঠে শুনল, তার পেছনে যেন কেউ হাই করে একটা শ্বাস ছাড়ল ।

“কে?” কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে অভয়।

কেউ জবাব দেয় না। কিন্তু অভয় আবার এগোতেই পেছনে আবার হাই-হাই-হাই শব্দ হতে লাগল। অভয় চলা ছেড়ে ছুটতে লাগল। পেছনে হাই-হাই শব্দটাও সমান বেগে তেড়ে আসছে। গাছপালা ক্রমে ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে, ঝোপঝাড় লতাপাতায় পথ এত দুর্গম যে, এগনো যাচ্ছে না। অভয় বারবার আছাড় খাচ্ছে, কিন্তু ঝোপঝাড়ের ওপর পড়ায় তেমন ব্যথা পেল না। তবে দুবার দুটাে গাছের সঙ্গে সঙঘর্ষ হল তার। তাতে ব্যথা পেলেও তার শরীরে ইতিমধ্যেই এত ব্যথা জমা হয়েছে যে, তার তুলনায় এ-ব্যথা নস্যি।

একটা ঘন ঝোপ পেরিয়ে হঠাৎ সামনে আলো দেখতে পেল অভয়। তেমন জোরালো আলো নয়। ভারী মোলায়েম মিঠে নীলচে একটা আভা। পেছনে হাই-হাই শব্দটা থেমেছে।

বিপদ কি তা হলে কাটল? সামনে কি কারও বাড়ি-টাড়ি আছে?

একটু বাদেই ভুল ভাঙল। বাড়ি নয়, সামনে একটু ফাঁকা গোল জায়গা। সেখানে কোথা থেকে যেন নীলচে একটা আলো এসে পড়েছে।

তারপর অভয় যা দেখতে পেল তাতে গায়ের রক্ত জল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ফাঁকা জায়গাটায় একটা অস্বাভাবিক লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা, গলায় পৈতে, সাদা ধবধবে লোকটার গায়ের রং। মাথায় জটা রয়েছে। পরনে শুধুমাত্র একটা লেংটি। হাতে একটা মুগুরের মতো জিনিস। ব্রহ্মদৈত্য !

লোকটা যেন অভয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল। নীলচে আলোয় একজোড়া ক্রুদ্ধ চোখ যেন নীল আলোয় ছাঁদ করে দিল অভয়কে।

লোকটা মুগুর তুলে অভয়ের দিকে এগিয়ে আসতেই অভয় দুহাত ওপরে তুলে “বাবা গো ! মেরে ফেললে!" বলে চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ব্রহ্মদৈত্য তার মুগুরটা নামিয়ে অভয়ের কাছে এসে নিচু হয়ে মুখটা দেখল। তারপর জঙ্গলের দিকে চেয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁক দিল, "কালু, এদিকে আয়।"

জঙ্গল ফুঁড়ে একটা কালোমতো মজবুত চেহারার লোক বেরিয়ে এল, হাতে টর্চ।

ব্রহ্মদৈত্য বলল, "একে চিনিস? ভাল করে মুখটা দেখ দিকি। "

কালু টর্চ জ্বেলে মুখটা দেখে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে না। এদিককার লোক নয়। কোথা থেকে এসে পড়েছে।"

ব্রহ্মদৈত্য মাথা নেড়ে বলল, "এর অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। খুব মারধর করেছে কেউ, গায়ে দাগড়া-দাগড়া কালশিটে। কিন্তু মুখ দেখে একে আমার খারাপ লোক মনে হচ্ছে না।"

"আমারও তাই মত।"

"তা হলে একে তুলে ডেরায় নিয়ে চল। বাঁচাতে হবে।"

কালু অত্যন্ত বলবান মানুষ। সে অভয়কে অনায়াসে তুলে একখানা চাদরের মতো কাঁধে ফেলে নিয়ে একটা শুড়িপথ দিয়ে এগোল। ব্রহ্মদৈত্য ফাঁকা জায়গাটার দুধারে দুটো ঝোপের আড়ালে রাখা দুটো স্পটলাইট নিবিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে কালুকে অনুসরণ করল।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ি। অন্ধকার, সামনের দিকটায় বিকট ধ্বংসস্তূপ। সেটা পেরনো বেশ কষ্টকর। কারণ, পুরনো কড়ি-বরগা, বিম, থাম, রাবিশ সব স্তূপাকার হয়ে আছে। সেটা পেরিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন জায়গা। কয়েকটা বড়-বড় খাঁচা আছে। জীবজন্তুর খাঁচা। একটা হয়েনা খাঁচার ভেতর থেকে হেসে উঠল। গ-র-র শব্দ করে উঠল অন্য খাঁচা থেকে একটা নেকড়ে। ব্রহ্মদৈত্য বা কালু, কেউ অবশ্য ভূক্ষেপ করল না।

বাড়ির পেছনের দিকটা একটা আলাদা মহল। সেটার অবস্থা কিছু খারাপ নয়। অবশ্য যথেষ্ট পুরনো হয়েছে এবং মেরামতি হয়নি।

একটা ঘরে কেরোসিনের বাতি জ্বলছিল। একটা খাটিয়া পাতা। সেখানে এনে অভয়কে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল কালু। গায়ে কম্বল চাপা দিল।

ব্রহ্মদৈত্য অভয়ের নাড়ি দেখে গভীর মুখে বলল, "একটু গরম জলে অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে নিয়ে আয়। আর টেটভ্যাক, আমি চট করে পাঁচন তৈরি করে আনছি।"

নিঃশব্দে দুজন মানুষ অভয়কে বাঁচাতে যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতে লাগল।

ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙল অভয়ের, তখন তার মনে হল, সারারাত সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। যা ঘটেছে তা সত্য নয়। কিন্তু চোখ চেয়ে ভোরের আবছা আলোয় সে যা দেখতে পেল তাও তার সত্য বলে মনে হল না। সে কি এখনও স্বপ্ন দেখছে? সে একখানা ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে আছে— কিন্তু এরকম তো হওয়ার কথা নয় ! এ ঘর তার চেনাও নয়।

সে চোখ বুজে ফেলল। গায়ে এখনও অসহ্য ব্যথা, মাথা ধরে আছে। তবু অভয় উঠে বসতে পারল। খাটিয়া এবং গায়ে কম্বল দেখে সে আরও অবাক। এত যত্নআত্তি তার কে করল?

আগের দিনের ঘটনা ধীরে-ধীরে সবই তার মনে পড়ে গেল। সকাল থেকে সন্ধে অবধি তাকে অমানুষিক কষ্ট আর নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। দানাপানি জোটেনি, তার ওপর ওই মার? এ সত্ত্বেও যে সে বেঁচে আছে সেটাই অবাক কাণ্ড। শুধু বেঁচেই নেই, গায়ে ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও সে অনেকটা হালকা আর সুস্থ বোধ করছে।

অভয় গায়ের কম্বলটা সরিয়ে ধীরে-ধীরে খাটিয়া থেকে নেমে মেঝের ওপর দাঁড়াল। ঘরটা বেশ বড়। বহু পুরনো বাড়ি বলে দেওয়ালের চাপড়া অনেক

জায়গাতেই খসে গেছে। উঁচু সিলিং। বেশ বড়-বড় দুটো খোলা জানলা দিয়ে ভোরের আবছা আলোতে বাইরের নিবিড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছে । সে কি এখনও মনসাপোঁতার জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে? এ-বাড়ি এখানে এল কোত্থেকে?

এখানে কারা থাকে?

কাল রাতের ব্রহ্মদৈত্যের কথা মনে পড়ায় সে একবার শিউরে উঠল।

অভয় ঘরের একমাত্র দরজাটা ভয়ে-ভয়ে একটু ঠেলল। ভেজানো দরজা মচ-মচ শব্দে খুলে যায়। দরজার ওপাশে একটা বেশ লম্বা দরদালান। দরদালানে পা দিয়ে দেখতে পেল, আশপাশে আরও দু-তিনটে ঘর রয়েছে। দরদালানের দরজা খুলে বেশ বড় উঠোনের মতো দেখতে পায় অভয়। উঠোনে পাঁচ-সাতটা জীবজন্তুর খাঁচা। তাতে হিংস্র চেহারার কয়েকটি পশু রয়েছে। নেকড়ে বাঘটাকে চিনতে পারল অভয়, হায়েনাটাকে চেনা-চেনা মনে হল। বাদবাকিগুলো সম্পর্কে তার উৎসাহ রইল না। কে পোষে এগুলো? উঠোনের ওপাশে ধ্বংসস্তূপ।

অভয় একটা বিচ্ছিরি পশুর ডাক শুনতে পেয়ে চমকে দরদালানে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই কে যেন বজ্রগম্ভীর গলায় বলে উঠল, “বাঃ, এই তো আমার ওষুধে দিব্যি কাজ হয়েছে।”

মুখ ফিরিয়ে ব্রহ্মদৈত্যকে দেখেই আঁ-আঁ করে ওঠে অভয়। ব্রহ্মদৈত্য হাসিমুখে বলে, “চেঁচিও না বাপু, ভয়ের কিছু নেই, আমি ব্রহ্মদৈত্য নই, মানুষ।”

অভয় এরকম দীর্ঘকায় মানুষ জীবনে দেখেনি। কত লম্বা হবে লোকটা? সাত ফুট বা আট ফুট নয় তো !

লোকটা যেন অভয়ের মনের কথা পড়ে নিয়ে বলল, “আমার হাইট দেখছ? তা মন্দ নয়। ছ ফুট সাত ইঞ্চি। প্ল্যাটফর্ম শু আর টপ হ্যাট পরলে সাত ফুটের ওপর।”

অভয় গলা-খাঁকারি দিয়ে সভয়ে বলল, “আপনি কে? আঁ-আমি বড় ভয় পাচ্ছি।”

"লম্বা লোককে ভয় কী?"

"আঁ-আপনি সত্যিকারের মানুষ তো "

"হ্যাঁ। সত্যিকারেরই। তবে মাঝে-মাঝে ব্রহ্মদৈত্য সাজতে হয় আর মানুষজনকে চোরাগোপ্তা মারধরও করতে হয়। নইলে ভগবানের দান এই জঙ্গল কি বাঁচাতে পারতুম ! আহাম্মক লোকগুলো গাছ কেটে আর জন্তু মেরে নিকেশ করছিল।"

"আপনি এখানেই থাকেন?"

"হ্যাঁ। এটাই আমার ডেরা বলতে পারো।"

"আপনি কি বাঙালি?"

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলে, "না হে বাপু ! গায়ের রং দেখছ না? আমি ঘোর ইউরোপিয়ান। সুইডেনে বাড়ি। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে চলে এসেছিলুম বছর দশেক আগে। সেই থেকে রয়ে গেছি।"

"আপনি কি সাধু?"

"সাধু হতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে বাপু, ভণ্ড নই। যা করার তা প্রাণপণ করি। একশো পারসেন্ট। তোমার দেশের লোকগুলো বড্ড লোভী। আহাম্মক আর অদূরদর্শী। বন-জঙ্গল, গাছপালার প্রতি কোনও মায়া নেই। যখন-তখন ইচ্ছেমতো গাছ কেটে চারদিক নাড়া করে দেয়। পশুপাখিও মারে নির্বিচারে। সেইটে বন্ধ করতে পেরেছি বলে আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

"আপনি এখানে এলেন কী করে? এই জায়গাতেই বা রয়েছেন কেন?"

"ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলুম। সাধুদের তো পরিক্রম করতেই হয়। এ-জায়গাটা ভালও লেগে গেল। সাধন-ভজনের পক্ষে ভাল জায়গা। তবে সাধু দেখে লোকেরা এসে বড্ড বিরক্ত করত। হাত দেখতে বলে, কোষ্ঠী বিচার করতে বলে, জলপড়া চায়, রোগ সারানোর বায়না করে। তিতিবিরক্ত হয়ে শেষে জঙ্গলে ঢুকে আত্মরক্ষা করলুম।"

"আপনি যে কী চমৎকার বাংলা বলেন।"

"কেন কইব না বাপু? আমার গুরু যে বাঙালি। তোমাদের ভাষাটিও ভারী মিষ্টি, শিখতে আমার কষ্ট হয়নি। এবার তোমার কথা শোনা যাক। তুমি কে? কী করে এখানে এলে? মারধরই বা খেলে কেন?"

অভয় ধীরে-বীরে সংক্ষেপে সবই বলল। খুনের মামলায় সাক্ষী দেওয়া থেকে শুরু করে ব্রহ্মদৈত্য অবধি ।

ব্রহ্মদৈত্য মাথা নেড়ে বললেন, "তোমাকে চোরাশিকারি মনে করে আমার শাগরেদ কালু ভয় দেখাতে ওই হাই-হাই আওয়াজ করতে-করতে তাড়িয়ে আনছিল। কালু হচ্ছে হরবোলা । আমিও তোমাকে মুগুরপেটা করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে আর সেটা করিনি। ওই গ্রামের লোকগুলোর ওপর তোমার নিশ্চয়ই খুব রাগ হচ্ছে! কিন্তু ওদের খুব দোষ নেই। এখানে খুবই ডাকাতের উৎপাত। পুলিশ কিছুই করতে পারে না । ঠাকুরের দয়ায় তুমি বেঁচে গেছ। এখন কি শরীরে একটু জোর পাচ্ছ বাপু?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তা হলে আমার ওষুধে ভালই কাজ হয়েছে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি। শরীরটাকে এত অবহেলা করছ কেন? তোমার বয়স তো ছবিবশ-সাতাশের বেশি নয়, এই বয়সে ওরকম থলথলে চেহারা কেন হবে? শরীর থলথলে হলে মানুষ ছুটতে পারে না, পরিশ্রম করতে পারে না, রোগভোগও দেখা দেয়। তুমি বোধ হয় খেলাধুলো বা ব্যায়াম করো না?"

অভয় লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে বলল, "আজ্ঞে না।"

ব্রহ্মদৈত্য বললেন, "ঠিক আছে, কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে শক্তপোক্ত করে দেবো। এখন আমার সঙ্গে ভেষজাগারে এসো, তোমার জন্য কয়েকটা পাতার রস করে রেখেছি। একটু তেতো লাগবে, কিন্তু মহা উপকার।"

ব্রহ্মদৈত্য অভয়কে যে ঘরটায় নিয়ে এলেন সেটা রীতিমত একটা ল্যাবরেটরি-বিশেষ। বকযন্ত্র থেকে শুরু করে বুনসেন বার্নার অবধি আছে। চারদিকে দেওয়ালের তাকে হরেকরকম ছোট-বড় কাঁচের শিশি ও জারে নানারকম তরল পদার্থ রয়েছে। ব্রহ্মদৈত্য একটা ছোট্ট গেলাসে খানিকটা তরল জিনিস দিলেন।

ঘন সবুজ রং।

অভয় সভয়ে বলে, “কী আছে এতে?”

“থানকুনি, কুলেখাড়া, কালমেঘ, পাথরকুচি আর আরও কয়েকটি পাতা। নির্ভয়ে খাও। এর পর আরও চিকিৎসা আছে।”

অভয় ওষুধ খাওয়ার পর ব্রহ্মদৈত্য তাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে এলেন। মেঝের ওপর মাদুর আর তার ওপর শতরঞ্চি পাতা, ব্রহ্মদৈত্য বললেন, “এবার কয়েকটা যোগ করাবো। গায়ের ব্যথা উবে যাবে।”

অভয় জীবনে কখনও ব্যায়াম করেনি বলে ভয় পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য তাকে এত ধীরে-ধীরে এবং সুকৌশলে নানারকম যোগাসন করিয়ে নিলেন যে, তার তেমন কোনও কষ্ট হল না। বরং বেশ আরাম লাগতে লাগল। সবশেষে কিছুক্ষণ শবাসন করিয়ে বললেন, “যাও এবার বিশ্রাম। আধঘণ্টা পর কিছু খেয়ে নিতে হবে। পেছনদিকে কুয়ো পাবে, খুব ভাল জল, স্নান করে নাও। তোমার জন্য ধুতি আর গামছা দরদালানে রাখা আছে।”

ঘণ্টাখানেক বাদে স্নান করে দই-চিড়ে খেয়ে যখন অভয় উঠল তখন তার শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। মনটাও খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলে সে এখন বেশ হাঁটাচলা এবং খানিকটা দৌড়বীদও করতে পারে। তারপর সে কৌতুহলী হয়ে ব্রহ্মদৈত্যকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, উঠোনে খাঁচার মধ্যে যেসব জীবজন্তু দেখছি ওদের কি আপনি পোষেন?”

“তা বলতে পারে। তবে ইচ্ছে করে পুষিনি। জঙ্গলের প্রাণীরা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। তীর-ধনুক, বল্লম, বন্দুক দিয়ে একেবারে পশুমেধ শুরু করেছিল লোকে। আমি যে কটাকে পেরেছি বাঁচিয়েছি। রাত্রিবেলা খাঁচাতেই থাকে। একটু বেলা হলে ছেড়ে দিই। সময়মতো ওরা ফিরেও আসে।”

ব্রহ্মদৈত্য ঘুরে-ঘুরে তাকে জায়গাটা দেখাচ্ছিলেন। চারদিকে একটা বেশ নিবিড় লতাপাতার প্রতিরোধ আছে। ঘর বাঁশবনও রয়েছে। ব্রহ্মদৈত্য বললেন, “এটা প্রায় দুর্গের মতো জায়গা। বাইরে থেকে এ-বাড়িটা দেখাও যায় না, দুম করে এসে হাজিরও হওয়া যায় না। ফলে নিরিবিলিতে ভালই থাকি। মনে হয় কোনও দেশী জমিদার এ-বাড়ি বানিয়েছিল, তখন হয়তো বসতিও ছিল এখানে। এখন সবই হেজেমজে গেছে।”

অভয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা, শুখানালা বলে কোনও জায়গা আছে এখানে?”

ব্রহ্মদৈত্য যেন একটু চমকে উঠে বললে, “শুখানালা? কেন, শুখানালা দিয়ে কী হবে?”

অভয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “কী আর হবে। ওই শুখানালায় আমাদের আদি বাড়ি ছিল। এখন নিশ্চয়ই কিছু নেই। তবে জায়গাটা একবার চোখে দেখতে পেলে ভাল লাগত।”

দুটো দীর্ঘ শক্তিমান হাত অভয়ের দু কাঁধে রেখে ব্রহ্মদৈত্য গম্ভীর মুখে অভয়ের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, “তোমার পদবি তো সরকার? বাই চান্স তুমি শুখানালার সরকারদের বংশধর নও তো?”

অভয় বলল, “হ্যাঁ, আমি সরকার-বাড়িরই ছেলে। তবে এখানে কখনও আসিনি।”

ব্রহ্মদৈত্য বললেন, “তুমি ছাড়া বোধ হয় সরকারদের আর কোনও বংশধর নেই। শোনো, সব রহস্য তোমার কাছে খুলে বলা যাবে না । কিন্তু এই

জঙ্গল ধরে যদি উত্তরদিকে যাও তবে খানিকদূর গিয়ে একটা শুকনো নালার মতো খাত পাবে। মনে হয় কোনও কালে ওটা নিকাশি খাল ছিল। ওইটে ধরে যদি এগোও তা হলে শুখানালায় পৌঁছনো কঠিন নয়। কিন্তু, সব ব্যাপারেই একটা মস্তবড় কিন্তু আছে।”

“কেন বলুন তো!"

“সেটা বললেও তোমার বিশ্বাস হবে না। তবে যদি তুমি বাস্তবিকই সরকারদের বংশধর হয়ে থাকো, তা হলে তোমার হয়তো ভয় নেই।”

উৎকণ্ঠ অভয় বলে, “ভয়ের কথা উঠছে কেন? ভয়ের জিনিস আমি মোটেই ভালবাসি না।”

“কেউই বাসে না বাবা। তবে শুখানালার ধারে-কাছে লোকে যায় না।”

“আপনিও না?”

“আমার কথা বাদ দাও। আমার অগম্য স্থান কমই আছে।”

হাঁটতে-হাঁটতে যখন ধ্বংসস্তূপটার কাছে এসে পড়েছে তারা, তখন হঠাৎ একটা ভারী মিষ্টি পাখির ডাক শোনা গেল। অভয় উৎকর্ণ হয়ে শুনল, পাখির ডাক সে বড় একটা শুনতে পায় না। বলল, “আচ্ছা, এ কি দোয়েল পাখি ডাকছে?”

ব্রহ্মদৈত্য সামান্য ভ্রূ কুঁচকে বলেন, “না, ও হচ্ছে কালু।”

“কালুকে বলুন তো?”

ব্রহ্মদৈত্য হেসে বললেন, “কালুও একদিন মানুষের নির্যাতনে পালিয়ে এসেছিল ডাকাতের দল গড়বে বলে। বিহারের গাঁয়ে ওর বাড়ি। কাজেই নিচু জাত বলে রাজপুতরা খুব অত্যাচার করত। বাড়ি জ্বালিয়ে, চাষের খেত কেড়ে নিয়ে সে অনেক কাণ্ড। মরতে-মরতে ছোকরা বেঁচে যায়। মতলব ছিল ডাকাতের দল গড়ে নিয়ে প্রতিশোধ নেবে। আমিই সেটা ঠেকাই! এখন আমার কাছেই থাকে।”

"ভারী সুন্দর শিস দেয় তো!"

"তোমার ভাল লাগছে শিসটা? আমার লাগছে না। কারণ, ওই শিসের একটা বিশেষ অর্থ আছে। কালু জানান দিচ্ছে যে, জঙ্গলে কিছু বাইরের লোক ঢুকেছে এবং তারা ভাল লোক নয়। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। সংখ্যায় তারা চারজন।"

অভয়ের মুখ এ-কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে একটু কাঁপা গলায় বলল, "সর্বনাশ ! এরা তো বোধ হয় পানু মল্লিকের দল!"

ব্রহ্মদৈত্য চিন্তিত মুখে অভয়ের দিকে চেয়ে বলেন,"তাই হবে। কারণ, স্থানীয় লোকদের কুসংস্কার আছে। তারা এ-জঙ্গলে ঢুকবে না।"

"এখন তা হলে কী হবে?"

"ভয় পেও না। ভয় পেতে নেই। বিপদের সময় ভয় পেলে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়, আর বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেলে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

"এদের ব্রহ্মদৈত্যের ভয় দেখালে হয় না?"

ব্রহ্মদৈত্য একটু হেসে মাথা নেড়ে বলেন, "সরল সোজা গ্রামবাসী হলে হত। কিন্তু এরা বোধ হয় পেশাদার খুনি। অত সহজে দমবার পাত্র এরা নয়। তা ছাড়া এরা মরিয়া, তুমি বেঁচে থাকলে এদের বিপদ।"

কাঁদো-কাঁদো হয়ে অভয় বলে, "তা হলে এখন আমি কী করব?"

"চিন্তা কোরো না। ওরা খুব সহজে এ-জায়গা খুঁজে পাবে না। তবে খুব বেশিক্ষণও লাগবে না। হয়তো দুপুরের দিকে ওরা ঠিকই খুঁজে-খুঁজে চলে আসবে এখানে। ততক্ষণে চলো, তোমাকে আর-একবার পাঁচন খাইয়ে দিই। গায়ে একটু বল পাবে। আরও একটা কথা আছে। তোমার মাথার বাঁদিকটা ওরা কামিয়ে দিয়েছে, ডানদিকটাও কামিয়ে নাও। আমার কাছে ভাল ক্ষুর আছে, চলো।"

তাই হল। ব্রহ্মদৈত্য তাকে আরও একটা বিকট স্বাদের পাঁচন খাওয়ালেন। তারপর মাথাটা পুরো ন্যাড়া করে দিলেন। তারপর প্রায় গরম-গরম

ডাল ভাত আর কচুসেদ্ধ খাইয়ে দিয়ে বললেন,“দুপুর প্রায় হয়ে এল। এবার তোমাকে এ-জায়গা ছাড়তে হবে । আমার অনুমান, চারটে খুনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এদিকে এসে পড়বে। পেশাদার গুণ্ডাদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই তোমাকে পালাতে হবে।”

অভয় হাতজোড় করে বলল, “কোথায় যাব?”

ব্রহ্মদৈত্য চিন্তিত মুখে বলেন, “আমি তো একটা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।”

“সেটা কী?”

“শুখানালা। তোমাদের আদি বাড়ি। উত্তরদিকে যেমন বলেছি তেমনই এগিয়ে যাও। একটা নাম মনে রেখো, ভীম সরকার। এখন পালাও।”

অভয় পালাল।

*************

সুদর্শনবাবু খুবই অবাক হয়ে লাখনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, “গোয়েন্দা-পুলিশ! গোয়েন্দা-পুলিশ এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই লোকটার খোঁজে বেরিয়ে গেল এ কেমন কথা! কেন, আমি কি মরে গেছি? সুদর্শন দারোগাকে ডিঙিয়ে নিজেদের সর্দারি ফলানো!”

লাখন হাতজোড় করে বলল, “আপনি তো জবরদস্ত দারোগা আছেন। আর ই চারটো আদমি বহুত খতরনাক আছে। শের কা মাফিক আখি আউর বহুত ওয়সা।”

সুদর্শনবাবু খুবই উত্তেজিতভাবে বললেন,“আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়েছিল?”

“না মালিক। উ লোক এক কৌন অভয় সরকারকে জানে মারতে এসেছে। ওহি বাত তো বলছিল। হামলোগকা বহুত ডর লাগল। এ ভি বলেছে যে, দারোগীবাবুকে কোই খবর-টবর দিলে খারাবি হেয়ে যাবে।”

সুদর্শনবাবু আঁতকে উঠে বললেন, “অ্যাঁ, তা হলে তো দেখছি জালি ব্যাপার। এরা তো পুলিশের লোক নয়।”

“ওহি বাত তো বোলতে আসলম মালিক। ইসব খতরনাক আদমি ডাকু আছে কি খুনি আছে কোন জানে! এখুন তো ভরসা আপনি।”

“আমি?” বলে সুদর্শনবাবু এই শীতেও কপালের ঘাম হাতের তেলোয় মুছে হাতটা ফের মুছলেন বুকপকেটের ওপর ঘষে। তারপর খুবই থমথমে মুখে বললেন, “দুনিয়ায় কোনও দারোগাই কখনও শান্তিতে থাকে না জানি। কিন্তু তোরা যে আমাকে খেতে-শুতে অবধি দিচ্ছিস না, এটা কি ভাল হচ্ছে রে!”

লাখন গদগদ হয়ে বলে, “জি মালিক, কিন্তু এখুন তো সবের টাইম আছে। দশটা বাজছ । এখুন তো কোই নিদ যানেক টাইম নেহি মালিক। তোবে ভুখ লাগার কথা আলাদা। ভুখ সোবসময় লাগতে পারে হুজুর।”

লাখন কথাটা শেষ করার আগেই দরজার কাছ থেকে কে যেন ভারী বিনয়ী গলায় বলে উঠল, “ভুখ লাগলেও কোনও চিন্তা নেই। দারোগাবাবুর যে সবসময় খিদে পায় সে আমরা খুব জানি। আর সেইজন্যই আসা।”

সুদর্শনবাবু একটা হুঙ্কার দিলেন, “তোরা কারা?” দরজার কাছ থেকেই হাতজোড় করে তিনজন ঘরে ঢুকল। একজনের হাতে একটা মেটে হাঁড়ি।

“আজ্ঞে, আমাকে চিনতে পারছেন না বড়বাবু? আমি রেমো নাপতে। এ হল অক্ষয়। আর ওই যে উঁচু দাঁত, ও হল গে নেতাই। রসময় হালুইকরের গরম-গরম কখানা জিবেগজা এনেছিলুম বাবু। একটু ইচ্ছে করুন।”

“জিবেগজা।” বলে দারোগাবাবু ঈষৎ প্রসন্ন মুখে বলেন, “ওই একটাই যা সুখ এখনও আছে রে। দুনিয়াটা পচে গেছে বটে, কিন্তু এখনও যে এ-দুনিয়ায় জিবেগজা হয়, জিলিপি হয়, এটাই যা ভরসার কথা। নিয়ে আয় এখানে।”

রেমো বিগলিত মুখে এগিয়ে এসে হাঁড়িটা টেবিলে রেখে মুখের সরাখানা সরিয়ে নিল। দারোগাবাবু গন্ধটা শুকে বললেন, “আঃ, এ একেবারে স্বর্গের জিনিস। দেবভোগ্য।”

“হেঁ-হেঁ, আপনি ছাড়া ভাল জিনিসের কদর আর কে বুঝবে বলুন! সমঝদার কই? তিরিশখানা আছে, আজ্ঞে । আপনার কাছে অবশ্য কিছুই নয়, তিন মিনিটে উড়ে যাবে।”

এ ত্রিশখানাও যা, তিনশোখানাও তাই।” এই বলে একখানা মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে চোখ আধবোজা করে বললেন, “মন্দ নয়।”

অক্ষয় রেমোর পেছন থেকে বলে উঠল, “আজ্ঞে, রসময় এ গজার নামই দিয়েছে দারোগাভোগ।”

রেমো বলল, “আর তার জিলিপির নাম শুনলে আপনি হাসবেন। জিলিপি হল গিয়ে সুদর্শনচক্র। খুব বিকোচ্ছে।”

সুদর্শনবাবু গোটা দশেক জিবেগজা উড়িয়ে দিয়ে কথা বলার ফুরসত পেলেন, “হ্যাঁ, এবার বল তোদের সমস্যাটা কী?”

অক্ষয় এগিয়ে এসে একটা নমো ঠুকে বলল, “আজ্ঞে, কাল রাতেও একটা ডাকাত একেবারে ভরসন্ধেবেলা ঢুকে পড়েছিল আমাদের গাঁয়ে। আপনি তো জানেন আমরা ভেড়ুয়া নই। মনসাপোঁতার লোকেরা ভগবান আর দারোগীবাবুকে ছাড়া কাউকে ভয় খায় না । তা আমরা ডাকাতটাকে সবাই মিলে এমন দাবড়ে দিলুম যে, পালানোর পথ পায় না। আর পালাল বলেই ভয় হল। ব্যাটা হুকুম সিং-এর দলের লোক। গিয়ে খবর দিলে হুকুম কি আর আমাদের ছেড়ে কথা কইবে।”

জিবেগজা খাওয়া থামিয়ে দারোগাবাবু ব্যথিত মুখে বললেন, “হাঁ রে, এই জিবেগজা খাওয়ার সময়েই কি ওসব অলক্ষুনে কথা বলতে হয়? তোদের এটুকু খেয়াল হল না যে, হুকুম সিং-এর নাম শুনলে সুদর্শন দারোগার জিভ অসাড় হয়ে যায়! দূর, খাওয়াটাই মাটি করলি তোরা।”

অক্ষয় জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, “এঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে বড়বাবু। আচ্ছা, আপনি বরং খেয়ে নিন। আমরা একটু বাইরে বসছি গিয়ে।”

সুদর্শনবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,“খাওয়াটাই যখন মাটি করেছিস তখন বাকিটাও বলে ফেল। জিবেগজা না হয় রয়েসয়ে খাওয়া যাবে।”

লাখন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার মাথা নেড়ে বলল, “ওই বাত ঠিক বলিয়েছেন। সবেরবেলায় তো আজ বহুত ভারী নাস্তা হয়েছে মালিক। হামি তো বিশটা পুরি-কচেরি আর তিন পৌয়া সবজি আপনার ভোগমে লাগালম। শোচ করছিলাম কি, দারোগা-মালিকের পেটমে আর কত জায়গা হেবে।”

দারোগাবাবু রোষকষায়িত লোচনে লাখনের দিকে চেয়ে বললেন, “তোর কথা তো শুনেছি। এখন যা তো। একটু শান্তিতে থাকতে দে।”

লাখন “রাম রাম” বলে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। দারোগাবাবু গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এবার তোরা বল । সকালে যে আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম!”

নেতাই বলল, “আজ্ঞে, বোধ হয় লাখনের মুখ দেখে। ব্যাটা বড় অপয়া। এই তো সেদিন তায়েবগঞ্জ থেকে ভোরবেলা ইস্টিশনে নেমেই দেখি লাখন। আর সেদিনই কিনা জীবনে প্রথম বিনা টিকিটের জন্য ধরা পড়লুম! গত বিশ বছর তায়েবগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি-আসছি, কস্মিনকালে টিকিট কাটিনি, হাসতে-হাসতে চলে এসেছি লাইন ধরে হেঁটে। আর সেদিন বারো টাকা গচ্ছা দিয়ে তবে রেহাই পাই।”

দারোগাবাবু হাতের একটা ঝাপটায় নেতাইকে চুপ করিয়ে বললেন, “ডাকাতের কথাটা বলে ফেল।”

অক্ষয় গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, “আজ্ঞে। এই বলি। তা হুকুম সিং-এর দলের লোকটা তো রাতে পালাল। সারারাত আমরা শলাপরামর্শ করলুম, এখন কী করা! হুকুম এসে তো গাঁ জ্বলিয়ে দেবে, গুলি চালাবে, লুটপাট করবে। মাথার ওপর আপনি আছেন বটে, কিন্তু পিদিমের নীচেই তো অন্ধকার কিনা, হুকুম ব্যাটার ভাগ্য ভাল যে, এমন ভাল একজন দারোগা পেয়েছে। নইলে এতদিনে তার জারিজুরি বেরিয়ে যেত।”

দারোগাবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, “আসল কথাটা বলবি ত!”

“আজ্ঞে, সেই কথাই বলছি। আজ সকালেরই ঘটনা। রাত পোয়াতে না পোয়াতেই কী বলব হুজুর, বন্দুক পিস্তল নিয়ে হুকুমের দলের চারজন ষণ্ডামার্কা লোক এসে হাজির। তখনও হুজুর, আমাদের বিষয়কর্ম শুরু হয়নি, প্রাতঃকৃত্যও করিনি, কাক অবধি সকালের আবর্জনা খায়নি, সবে মোরগ ডাকতে লেগেছে, এমন সময় চার-চারটে দানো এসে গাঁয়ে সে কী তুলকালাম বাঁধাল, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই রদ্দা, লাথি, চড় মারছে আর বলছে, বল অভয় সরকারকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস! আমরা তো হুজুর, যাকে বলে একগাল মাছি। ভয়ে আত্মারাম সব খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। দু-চারজন পালিয়ে যেতে পারল বটে, কিন্তু এই যে রেমো, এ তিনটে লাথি খেয়েছে।”

রেমো খাঁক করে উঠল, “আর তুমি বুঝি খাওনি! একা আমাকেই বুঝি অপমান করেছে?”

অক্ষয় সঙ্গে-সঙ্গে বলে, “আজ্ঞে, সে-কথাও ঠিক। আমার কাঁকালেও কী যেন একটা লেগেছিল। সেটা লাথিও হতে পারে।”

রেমো দৃঢ় স্বরে বলে, “লাথিই। কী হে নেতাই, তুমিই বলো না!”

নেতাই বলল, "লাথির মতোই মনে হয়েছিল।" অক্ষয় সঙ্গে-সঙ্গে নেতাইয়ের দিকে চেয়ে বলে, "তুমিও বাদ যাওনি নেতাইদা। তিনখানা রদ্দা তোমাকে আমি নিজের চোখে খেতে দেখেছি।"

নেতাই বলে, "তিনখানা নয় রে বাপু, দুখানা মারতে পেরেছিল, তিন নম্বরটা আমি পাশ কাটিয়ে দিয়েছি, ছুয়ে গেছে বলতে পারিস। তা ওই আড়াইখানাই ধর। তোর কথাও থাক, আমার কথাও থাক।"

দারোগাবাবু রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে বললেন, "ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে আসল কথাটা বলবি?"

অক্ষয় হাতজোড় করে বলে,"আজ্ঞে, আমরা সকলেইঅল্পবিস্তর মারধর খেয়েছি। বিশের জ্যাঠামশাইয়ের মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরে আলু তুলে দিয়েছে। সদানন্দের নাক ভেঙেছে। তারপর এইসব হুজ্জত করে তারা যখন গাঁ একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলছে তখন আমরা তাদের বলে দিলুম, বাপু হে, আমাদের মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে আর কী হবে। অভয় সরকার মনসাপোঁতার জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। যদি ব্রহ্মদত্যির হাত থেকে বাঁচে তো বুনো কুকুরের মুখে পড়বে। তা ছাড়া নেকড়ে আছে, হাতি আছে। সেই শুনে তারা আমাদের ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।"

দারোগাবাবু অতিশয় ব্যথিত মুখে বললেন, "হ্যাঁ রে, মনসাপোঁতার জঙ্গল ছাড়া কি আর আসামিদের যাওয়ার জায়গা নেই। ওই ভয়ের জায়গাটায় গিয়ে চোর-ডাকাতরা সেঁধোলে আমিই বা কী করি। ওদের যে কবে আক্কেল হবে সেটাই বুঝি না।"

নেতাই গলা বাড়িয়ে বলে, "আজ্ঞে, সে-কথা আমরাও বলাবলি করি। কলির শেষ কিনা, সবই উলটো হচ্ছে। আমার মেজোমামা তো বলেন, কলির শেষে নদী উজোনে বইবে, মেয়েমানুষ সব পুরুষ হবে আর পুরুষেরা মেয়ে, পাথরে দুবো গজাবে । তা দেখছি সেরকমই সব হচ্ছে।"

দারোগাবাবু একটু মনমরা হয়ে বললেন, “ভরসা একটাই। ব্যাটা ব্রহ্মদৈত্য যদি পাঁচটাকে ধরে চিবিয়ে খায়।”

"একটু নুন দিয়ে।” ফোড়ন কাটে নেতাই।

অক্ষয় হাতজোড় করে বলে, “আজ্ঞে, তাতে কোনও ভুল নেই। তবে কিনা বেহ্মদত্যিটার আবার জিভের খুব তার। যাকেতাকে খায় না। এই তো শ্রীপদ, হারু মল্লিক এরাও সব তেনার খপ্পরে পড়েছিল কিনা, মাথায় মুগুর মেরে ফেলে দিয়ে চেটে দেখেছে, সব ক’টা অখাদ্য। তারপর জঙ্গলের বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে গেছে।”

দারোগাবাবু কৌতুহলী হয়ে বলেন, “তা হলে খায় কাকে?”

নেতাই হাতজোড় করে বলে, “অভয় দেন তো বলি। হুজুরের মতো নাদুস-নুদুস লোক পেলে বেহ্মদত্যি ব্যাটা চেটেপুটে খাবে। ছিবড়েটুকু অবধি ফেলবে না। আর ভগবানের দয়ায় হুজুর, আপনার শরীরে ছিবড়ের আশটুকু অবধি নেই। একেবারে নধরকান্তি জিনিস, সবটুকুই একেবারে থলথল করছে। কপাকপ খেলেই হল।”

"মুখ সামলে!" বলে একটা বাঘা হুঙ্কার দিয়ে সুদর্শনবাবু রুমালে কপালের ঘাম মুছে বললেন, “নজর দিয়ে-দিয়েই ব্যাটারা আমার বারোটা বাজাল। তাই তো পিসি আমাকে এখনও কাজলের ফোঁটা দিয়ে তবে বেরোতে দেয়। আর ওরে আহাম্মক, ব্রহ্মদৈত্য আমাকে খেলে তোর কিছু সুবিধে হবে?”

“আপনি গেলে আমরা অনাথ হয়ে যাব। ও-কথা বলবেন না, শুনলেও পাপ হয়। বাড়ি গিয়ে কানে একটু গঙ্গাজল দেব। বলছিলাম কি, হুজুর, বেহ্মদত্যির নজর খুব উঁচু। যেমন-তেমন লোক মুখে রোচে না। হুজুরের মতো মান্যগণ্য উচু থাকের লোক হলে তবেই সে একটু খায়।”

সুদর্শনবাবু দু'চোখে নেতাইকে ভস্ম করার চেষ্টা করতে-করতে বললেন, "ফের যদি ওরকম অলক্ষুনে কথা বলবি তো তিনশো দুই ধারায় ফাটকে পুরে রাখব।"

নেতাই মাথা মেঝেয় ঠেকিয়ে নমো ঠুকে বলল, "আজ্ঞে, এবার থেকে ওরকম কথা বলার আগে আমার যেন জিভ খসে যায়। তিনশো দুই ধারাটা কীরকম হুজুর? আমাদের মতো চাষাভুষোর বেলায় খাটে?"

"সে আমিও জানি না। কতরকম ধারা আছে। তবে এই চক্রপুরে আমার মুখের কথাই হচ্ছে ধারা। বুঝলি?"

বিগলিত নেতাই বলে, "খুব বুঝেছি আজ্ঞে। আমরা হাড়ে-হাড়ে জানি যে, হুজুর শুধু ধারাই নন, তিনিই আমাদের আইন-আদালত, মা-বাপ, তিনিই ভগবান। এ আর নতুন কথা কী?"

"কথাটা মনে রাখিস। এখন ছেদো কথা ছেড়ে কাজের কথায় আয়। পাঁচ-পাঁচটা ডাকাত মনসাপোঁতার জঙ্গলে ঢুকে বসে আছে, এ নিয়ে তদন্ত না করলে সরকারকে আমি বলব কী? তার ওপর লাখনটা খবর দিয়ে গেল, কাল সন্ধেবেলায় চারটে লোক গোয়েন্দা-পুলিশ বলে নিজেদের জাহির করে এ-তল্লাটেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। তাদের ধরলে হয় মোট ন'জন। এতগুলো বদমাশকে ঠাণ্ডা করা কি যে-সে কথা! দারোগাদের জীবন সুখের নয় জানি, কিন্তু তা বলে এরকম নাকালও হতে হয় বাপ!"

নেতাই তদ্‌গত হয়ে বলল, "আপনার কষ্ট চোখে দেখা যায় না হুজুর। শক্ত মানুষ বলেই এখনও বর্তে আছেন। তবে কিনা কুঞ্জখুড়ো এক লাখ টাকায় উঠেছে।"

এ-কথায় সুদর্শনবাবু ঝাঁকুনি মেরে সোজা হয়ে বললেন, "বলিস কী! এ-কথা আগে বলতে হয়। এবার তো তা হলে গতর নাড়তেই হচ্ছে।"

অক্ষয় হাতজোড় করে বলে, “হুজুর, একটা কথা আছে। কালকে যে ডাকাতটাকে ধরেছিলুম সে নিজে মুখে কবুল করেছে যে, হুকুম সিং শুখানালার সরকারদের পোড়ো বাড়িতে লুটের মালপত্র পুঁতে রেখেছে। আর সেখানেই তার ঘাঁটি।”

“শুখানালা! ও বাবা, সে তো ভীম সরকারের তল্লাট। মাছিটাও গলতে পারে না।”

রেমো শুকনো মুখে বলল, “হুজুর, কথাটা ধরবেন না। লোকটা ভয় খেয়ে উলটোপালটা বলেছে।”

সুদর্শনবাবু কাহিল মুখে বললেন, “যাঃ, লাখ টাকা জলে গেল। ওঃ, দারোগাদের দুঃখ যদি এইসব চোর-ডাকাত একটু বুঝত!”

নেতাই বলল, “বুঝবে হুজুর, সত্যযুগটা আসতে দিন। তখন বুঝবে। কলির শেষ কিনা, তাই হুজুরের মতো লোকদের এত কষ্ট। তা হলে হুজুর, আমরা বিদেয় হচ্ছি। শুধু যদি দয়া করে আমাদের গাঁয়ে দু-একজন সেপাইকে দু-চারদিন একটু রোঁদে পাঠান তবে ভাল হয় । কিছু করুক না করুক, পুলিশ দেখলেই আমাদের বুকে একটু বল-ভরসা আসে। এই কথাটুকুই বলতে আসা।”

“সে হবেখন।” বলে লোকগুলোকে বিদেয় করে সুদর্শনবাবু চোখ বুজে ষ্ট্র্যাটেজি ভাবতে লাগলেন।

চারজনের হাতেই অত্যন্ত ধারাল চপার, বাঁ হাতে পিস্তল। তারা চারজনই খুব শক্তপোক্ত এবং দুর্গম জায়গায় যাওয়ার অভ্যাস আছে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে তারা একটু দূরে-দূরে ছড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু যোগাযোগ হারাল না। শিস দিয়ে-দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। চপার দিয়ে ঘন ঝোপঝাড় বা লতাপাতা কেটে পথ করে নিচ্ছিল তারা । ভয়ডরের লেশমাত্র তাদের হাবভাবে

দেখা যাচ্ছিল না । ইন্দ্রিয় তাদের খুবই সজাগ । চোখ তীক্ষ্ণ এবং দয়ামায়ার লেশমাত্র সেখানে নেই। হাতে-পায়ে চিতাবাঘের মতো তৎপরতা।

একটা বাঁশঝাড়ের কাছ বরাবর এসে তিনু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। তার স্পষ্টই মনে হয়েছে কেউ তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করছে। সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখে নিল। তারপর সঙ্গীদের সতর্ক করতে একটা টু-হিট শিস দিল। তারপরই সে শুনতে পেল, তার সঙ্গীরা নয়, অন্য কেউ ঠিক দোয়েলের মতো শিস দিল। খুবই নিখুঁত। অভ্যস্ত কান না হলে অবশ্যই পাখি বলেই ধরে নিত।

শিসটা লক্ষ করে বাঁদিকে একটা ঘাসজঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই আবছা সে একটা লোকের দ্রুত অপসৃয়মাণ অবয়ব দেখতে পেল । চোখের পলকে পিস্তল তুলে গুলি করল তিনু। সামনে একটা পতনের শব্দ হল। লেগেছে!

তিনু দৌড়ে গিয়ে দেখল, এক জায়গায় ঘাসের কিছুটা শুয়ে পড়েছে! কেউ এখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তবে সে পালিয়েছে। ঘাসে এবং জমিতে রক্তের দাগ খুঁজল তিনু পেল না। লোকটা যেই হোক, অভয় সরকার হতে পারে না। কারণ, অভয় সরকারকে সে দেখেছে। মোটাসোটা নাড়গোপাল-মার্কা লোক । দৌড়ঝাঁপ তার কর্ম নয়।

রক্তের দাগ না পেলেও লোকটা কোন পথে গেছে তার হদিস পেয়ে গেল তিনু। আর এই পথেই যাওয়া উচিত কাজ হবে। সে শিস দিয়ে সঙ্গীদের ইশারা করে এগোতে লাগল।

একটু বাদে একটা ঝোপ পেরিয়ে সে একটা ফাঁকা জায়গায় পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে এত পরিষ্কার জায়গা মানুষের কাজ ছাড়া হতে পারে না। অতএব, কাছেপিঠে মানুষ আছে।

একে-একে পচা, ল্যাংড়া আর সত্ত্বও এসে ফাঁকা জায়গাটায় জড়ো হল।

তিনু তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, “ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলছিল না স্টেশনের ওই কুলিটা?”

পচা বলল, “গাঁয়ের লোকগুলোও বলছিল।” তিনু গম্ভীর মুখে বলে, “মনে হচ্ছে ব্রহ্মদৈত্যকে এবার আমরা পেয়ে যাব।”

একটু খুঁজতেই শুড়িপথটার সন্ধান পেয়ে গেল তারা। সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে তিনু আগে এবং পেছনে তার তিন খুনে সঙ্গী দ্রুত-পায়ে এগোতে লাগল।

দশ মিনিটের মধ্যেই তারা ধ্বংসস্তুপটার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনু ঘড়ি দেখল। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। সে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলে, “অভয়কে এখানেই পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। কাজ সেরে সন্ধের ডাউন গাড়ি ধরা যাবে।”

তারা ধ্বংসস্তুপটা খুব অনায়াসেই ডিঙিয়ে গেল। উঠোনে জন্তু-জানোয়ারের খাঁচাটার দিকে একটু ভুক্ষেপ করল মাত্র তারা। তারপর সোজা গিয়ে দরদালানে উঠল।

দরজা খোলাই ছিল। একটা কাঠের চেয়ারে একজন অত্যন্ত দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ প্রৌঢ় বসে একখানা বই পড়ছেন। চারজনকে দেখে বিস্মিত চোখে তাকালেন, “আপনারা!”

তিনু তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে দেখে নিয়ে বলল, “বাংলা জানেন দেখছি! নিশ্চয়ই ইউরোপিয়ান!”

প্রৌঢ় মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, “জঙ্গলে কী করছেন আপনারা?”

তিনু মৃদু হেসে বরে,“আপনার ভয় নেই। আমরা ব্রহ্মদৈত্যকে খুঁজছি না। আপনার হাইট কত? সাড়ে ছ’ফুট?”

“ছ ফুট সাত ইঞ্চি।”

“ব্রহ্মদৈত্য সাজবার পক্ষে চমৎকার হাইট।”

প্রৌঢ় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, “আপনারা পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। বসুন।”

তিনু মাথা নেড়ে বলল, "বসবার সময় নেই। আমরা পুলিশের লোক। একজন ফেরারি খুনি আসামিকে খুঁজছি। তার নাম অভয় সরকার। মনে হচ্ছে, আপনার কাছে তার খোঁজ পেয়ে যাব।"

প্রৌঢ় একটু দোনোমোনো করলেন, তারপর বললেন, "অতিথি নারায়ণ।"

তিনু হেসে বলে, "তার মানে কি? অতিথি শুধু আমরাই নই, অভয় সরকারও! শুনুন, আমার অনুমান অভয় সরকার এখানে আছে।"

প্রৌঢ় একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ভারতবর্ষের পুলিশ সার্ভিস রিভলভার ব্যবহার করে। তাদের কাছে অত্যাধুনিক বারো শটের জামান পিস্তল থাকে না। আর ওই প্রফেশনাল চপার, ও-জিনিসও পুলিশের জিনিস নয়।"

"বন্দুক-পিস্তল তো আপনি ভালই চেনেন দেখছি। নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আছে নাকি?"

"ছিল। যখন মিলিটারিতে ছিলুম।"

তিনু হাসল, "আলাপ করে ভালই লাগল। কিন্তু গল্প করতে তো আসিনি বুঝতেই পারছেন। অভয় সরকারকে আমাদের চাই।"

প্রৌঢ় গম্ভীর মুখে বললেন, "আপনাদের উদ্দেশ্য কী, তা জানি না। তবে অভয় সরকারকে আমি লুকিয়ে রাখিনি।"

তিনুও এবার গম্ভীর হল। গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "আমাদের উদ্দেশ্য একজন অতি-বদমাশ লোককে ধরে নিয়ে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া। যদি সেটা সম্ভব না হয় তা হলে তাকে হত্যা করারও হুকুম আছে। আমরা আমাদের কর্তব্য করতে এসেছি মাত্র।"

"আপনারা কি সত্যিই পুলিশ?"

"হ্যাঁ, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ।"

"আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে পারবেন?"

নেই। বিশেষ কারণ ছাড়া। আমরা সেগুলো সঙ্গেও আনিনি। স্টেশনে আমাদের মালপত্র রয়েছে, তার মধ্যেই আছে। জঙ্গলে আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হবে বলে জানতাম না।" এই বলে তিনু ঘড়ি দেখল।

প্রৌঢ় গম্ভীর মুখে বললেন, "অভয় সরকার এখানে নেই। অনেকক্ষণ আগেই সে চলে গেছে।"

"কোথায় গেছে?"

"তার যাওয়ার বিশেষ জায়গা আছে বলে জানি না। তবে আপনারা বা অন্য কেউ তার সন্ধানে আসতে পারেন বলে তার ভয় ছিল। তাই সে স্থানত্যাগ করেছে মাত্র।"

তিনু মাথা নেড়ে বলে, "এত জলের মতো সহজ গল্প আমরা বিশ্বাস করব ভেবেছেন? অভয় সরকার স্থানত্যাগ করলে আমাদের হাত এড়াতে পারত না। আমরা এ-জায়গা খুঁজে দেখব।"

প্রৌঢ় বইটা আবার খুলে চোখের সামনে ধরে বললেন, "স্বচ্ছন্দে। শুধু অনুরোধ, আমার সামান্য জিনিসপত্র আছে, ওগুলো বিনষ্ট করবেন না।"

"ভাল কথা। আপনার কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে? জঙ্গলের মধ্যে কেউ একজন আমাদের ওপর নজর রাখছিল। কিন্তু সে লোক আপনি নন। সে কে?"

প্রৌঢ় অসহায় ভঙ্গিতে হাত উলটে বললেন, "কে জানে?"

তিনু একটু হেসে বলে, "আমি কিন্তু তাকে গুলি করেছি। গুলি খেয়েও সে পালিয়ে যায়।"

প্রৌঢ় এ-কথায় কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন, "গুলি করেছেন। সর্বনাশ! গুলি করলেন কেন?"

"বললাম তো সে আমাদের ওপর নজর রাখছিল।"

প্রৌঢ় বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়ে আপনমনে বললেন, "সেইজন্যই অনেকক্ষণ কোনও সঙ্কেত দেয়নি! হায়, আপনি কি তাকে মেরে ফেলেছেন?"

“সে মরলেও মরেছে নিজের দোষে। কিন্তু আমরা জঙ্গলে কোনও রক্তের দাগ দেখিনি।”

“সর্বনাশ! সে তো কোনও অন্যায় করেনি! সে কেবল জঙ্গলে কাঠুরে আর চোরাশিকারীদের খবর আমাকে দেয়।”

তিনু পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “তা হবে। কিন্তু সে-কথা আমাকে সে জানাতে পারত!”

প্রৌঢ় হাত বাড়িয়ে তিনুর ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন, “হাতে পিস্তল থাকলেই বুঝি গুলি চালাতে ইচ্ছে হয়?”

প্রৌঢ়ের থাবায় তিনুর কবজি। তিনু যথেষ্ট বলবান। তবু এই প্রৌঢ়ের হাতের জোর তাকে স্তম্ভিত করে দিল। হাত থেকে পিস্তলটা খটাস করে পড়ে গেল মাটিতে এবং যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল তিনু। লোহার মতো শক্ত আঙুলের চাপে তার কবজি ভেঙে যাচ্ছে।

তবে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র । পচা ত্বরিত গতিতে তার ভারী পিস্তলের বটটা সজোরে বসিয়ে দিল প্রৌঢ়ের মাথায়। প্রৌঢ় ঢলে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে। পচা পিস্তলটা ঘুরিয়ে ভূপাতিত সংজ্ঞাহীন প্রৌঢ়ের দিকে তাক করে তিনুর দিকে চেয়ে বলল, “শেষ করে দেব? তা হলে আর সাক্ষী থাকবে না।”

তিনু একটু চিন্তিতভাবে বলল, “দিবি? দে তা হলে। কিন্তু আমরা কত সাক্ষী লোপাট করব? আমাদের খুনখারাপির তো হাজার-হাজার সাক্ষী আছে। হয়েছে তো কাঁচকলা। একে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে লোকটা সাহেব, হয়তো ঝামেলা পাকাবে।”

পচা পিস্তলের সেফটি ক্যাপটা খুলে ট্রিগারে আঙুল দিতেই দরদালানের ওপাশে ধপ করে একটা শব্দ হল। চারজন চেয়ে দেখল, দরদালানের শেষ মাথায় একজন লোক ভীত মুখে দাঁড়িয়ে। তারা তাকাতেই লোকটা হাতজোড় করে

বলল, “ওঁকে মারবেন না। উনি সাধু মানুষ। জঙ্গলের মধ্যে আমিই আপনাদের ওপর নজর রেখেছিলাম। আমি কালু।”

নিষ্কম্প তিনটে পিস্তল কালুর বুকের দিকে একচক্ষু হয়ে চেয়ে ছিল। তিনু তার তিন সঙ্গীকে হাত তুলে নিবারণ করে কালুকে বলল, “গুড বয় কালু। তোমাকেই বোধ হয় জঙ্গলের মধ্যে আমি গুলি করেছিলাম। তোমার কপাল দেখছি খুব ভাল। ভয় পেও না, আমরা ঝামেলা করতে আসিনি। অভয় সরকার কোথায়?”

“আজ সকালে উনি চলে গেছেন।”

“কোথায় গেছে?”

“শুখানালা।”

“সেটা কোথায়?”

“উত্তর দিকে। দু-তিন মাইল হতে পারে। পাহাড়ের নিচে।”

“ঠিক আছে কালু, তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

যদি অভয় সরকারকে না পাই তাই তোমাকে জামিন রাখছি। তার আগে তোমাদের এই ডেরাটা অবশ্য আমরা সার্চ করব। সাবধানের মার নেই। আর তোমার সাধুবাবার জন্য চিন্তা কোরো না । উনি শক্ত ধাতের জিনিস। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বেন।”

চারজন পিস্তলধারী কালুকে পথপ্রদর্শক নিয়ে তন্নতন্ন করে সারা বাড়িটা খুঁজল। তারপর আশপাশে ঝোপঝাড়ে এবং ছাদের ওপরেও।

অনুসন্ধান করে ফিরে এসে তারা দেখল, সাধুবাবা উঠে বসেছেন। দু হাতে মাথা রেখে উবু হয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়তে দেখছেন মেঝের ওপর।

তিনু একটু নম্র স্বরে বলল, “আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও ঝগড়া নেই। মাফ করবেন।”

তারপর কালুকে নিয়ে তারা চারজন বেরিয়ে পড়ল।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথচলা যে কী কঠিন ব্যাপার তা যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অভিজ্ঞতা অভয়েরও নেই। লতাপাতা, কাঁটাঝোপ এবং মাঝে-মাঝে দুর্ভেদ্য বাঁশঝাড় এমন শক্ত বেড়ার মতো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় যে, চলা বন্ধ হয়ে যায়। সাপখোপ জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই। তবু ঘণ্টা দুই অভয় একটানা হাঁটল। না, ঠিক হাঁটা বলা যায় না। কখনও হামাগুড়ি, কখনও স্রেফ বুক ঘেঁষটে, কখনও ছোটখাটো গাছের ডাল ধরে ঝুল খেয়ে নানা কায়দায় তাকে এগোতে হচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তার যে এত এলেম ছিল এটাই জানত না অভয়। কাল সারাদিন ওরকম দৌড়ঝাঁপ, তারপর সন্ধেবেলা হাঁটুরে মার, অনাহার সত্ত্বেও আজ এই কঠিন অভিযান, সে পারছে কী করে? স্বাভাবিক নিয়মে তার তো এখন বিছানায় পড়ে থাকার কথা!

শুধু চলছেই না অভয়, জঙ্গলের সবুজ সৌন্দর্য, নির্জনতা এবং পাখির ডাক সে উপভোগও করছে। এত সবুজ, এত গভীর নির্জনতা যে কোথাও আছে তা তার খেয়ালই হয়নি। ঠিক বটে, নানা পাতা আর ঝোপঝাড়ে ঘষা লেগে তার গা চুলকোচ্ছে, মৌমাছির হুলও খেতে হয়েছে কয়েকবার, অল্পের জন্য একটা কাঁকড়া-বিছেকে মাড়িয়ে দেয়নি, কাঁটা লেগে হাত-পা কিছু ছড়ে গেছে, তবু বেশ ভালই লাগছে তার। বনের মধ্যে সে দু জায়গায় দুটো চেনা ফলের গাছ পেয়ে গেল। প্রথমে পেল একটা পেয়ারা গাছ। দিব্যি কাঁচা-পাকা পেয়ারা ধরে আছে। গোটকয়েক খেয়ে গোটাকয়েক পকেটেও পুরে নিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে পেয়ে গেল একটা পেপে গাছ। পাকা পেপের মতো জিনিস হয় না। সে একটা নরম গাছের ডাল ভেঙে আঁকশি বানিয়ে টপাটপ দুটো পেপে পেড়ে মহানন্দে খেয়ে নিল । ব্রহ্মদৈত্যের পাঁচনের গুণ এবং হাঁটার ফলে যে ব্যায়াম হচ্ছে তাতে খিদেটা বেশ চাগাড় দিচ্ছে। ফলটল খেয়ে একটা বড় গাছের তলায় বসে জিরোতে-জিরোতে সে খানিকক্ষণ পাখির ডাক শুনে নিল । জীবনে শিস দেয়নি অভয়, চেষ্টাও করেনি। ওসব তার আসেও না। আজ হঠাৎ পাখির ডাক শুনে তার শিস

দিতে ইচ্ছে হল। দেখল, বেশ ভালই শিস দিতে পারে সে । গুনগুন করে একটু গান গাইতে গিয়ে বুঝতে পারল, গলায় তার সুরের খুব একটা অভাব নেই তো ! তা হলে সে এতকাল এসবের চর্চা করেনি কেন?

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে বসল অভয়। নিজের সম্পর্কে আজ তার নতুনরকমের ধারণা হচ্ছে। অত দৌড়েও সে তেমন জব্দ হয়নি, অত মার খেয়েও সে মরেনি এবং জঙ্গলের দুর্গম রাস্তায় প্রায় টারজানের কায়দায় দিব্যি তো সে এতখানি চলে এল। তা হলে কি নিজেকে সে যতটা অপদার্থ ভাবত ততটা সত্যিই নয়? তা হলে কি অভয় সরকার নামে এই থলথলে, বিদিকিচ্ছিরি লোকটাকে একেবারে বাতিলের দলে না ধরলেও চলে? ইস, জীবনের ছাব্বিশ-সাতাশটা বছর কেবল কুঁড়েমি করে, খেয়ে আর ঘুমিয়ে, তেমন কোনও কাজ না করে সে তো বরবাদ করে দিয়েছে। বাপের কিছু টাকা আর সম্পত্তি ছিল, সেটাই ভাঙিয়ে কেবল পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল । অথচ তার মধ্যে তো জিনিস ছিল!

নিজের সম্পর্কে এই আবিষ্কার করে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল অভয়। আত্মবিশ্বাস আসার সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীরেও যেন দুনো বল চলে এল । গা বেশ গরম হয়ে উঠল । মনে চলে এল দুর্জয় একটা সাহসের ভাব। জঙ্গলে শোনার কেউ নেই, তবু অভয় হঠাৎ বেশ হেঁকে বলে উঠল, “আমি কাউকে ভয় খাই না।”

অভয় এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, এক্ষুনি একটা বীরত্বের কাজ না করলে যেন তার রক্তের টগবগানিটা থামবে না। সে গিয়ে সামনে যে গাছ পেল তারই একটা ডাল মড়াত করে ভেঙে ফেলল। তারপর বই-বাই করে সেটা কিছুক্ষণ লাঠির মতো ঘোরাল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, “কাউকে না! কাউকে না! কাউকে ভয় খাই না! আয় না ব্যাটারা কে আসবি! আয় না!”

কেউ অবশ্য এগিয়ে এল না, তবে দুটা ঘুঘু পাখি গাছের ডালে বসে বিশ্রাম করছিল, বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল।

অভয় লাঠি হাতে এবার সদর্পে জঙ্গল ভেঙে এগোতে লাগল। ঠোঁট ছুঁচোলো করে মাঝে-মাঝে শিস দিচ্ছিল। মাঝে-মাঝে বেশ জোর গলায় গান গাইছিল। আবার মাঝে-মাঝে বাঘা চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছিল কেউ তার সঙ্গে লাগতে আসছে কিনা। আর এই দেখতে-দেখতেই হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে সে একটা গর্তের মতো জায়গায় ধপাস করে পড়ে গেল। অবশ্য লাগল না। কারণ গর্ত হলেও লম্বা-লম্বা ঘাসে একেবারে নরম গদি হয়ে আছে। গর্ত থেকে উঠতে গিয়ে অভয়ের মাথায় ব্রহ্মদৈত্যের কথাটা চড়াক করে গেল। এই সেই শুখানালা নয়তো! শুকনো নালার খাত!

কাল রাতে গাঁয়ের একটা লোক ভীম সরকারের কথা বলেছিল। আজ ব্রহ্মদৈত্যও বলছিলেন। ভীম সরকার কে এবং কেন তাঁকে এদের এত ভয়, তা অভয় জানে না। সরকার পদবি যখন, তখন হয়তো অভয়দের কোনও আত্মীয় হবেন । কিন্তু শুখানালায় তাদের কোনও আত্মীয় আছেন বলে সে শোনেনি । তার দাদুর আমলেই এখানকার বাস উঠে যায়।

অভয় অতশত ভাবল না। বস্তুত ভেবে তার লাভও নেই। সামনে যদি বিপদ থেকে থাকে, পেছনেও বিপদ। বিপদের অভাব যখন নেই তখন বিপদের সঙ্গে ভাব করে ফেলাই ভাল।

লাঠিটা বাগিয়ে বীরদর্পে অভয় সামনে এগোতে লাগল। একটু বাদেই বুঝল, এটা শুখানালাই বটে। কোমরসমান গভীর এবং হাতচারেক মাত্র চওড়া নালাটায় অবশ্য এখন উদ্ভিদ ভরে আছে। এগোন শক্ত। বেশ বাঁক খেয়ে-খেয়ে খাতটা কোথায় যে গেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। অভয় বনের শোভা দেখতে-দেখতে আনমনে এগোচ্ছে। কিছু খারাপ লাগছে না তার । হাতের লাঠিগাছ দিয়ে

মাঝে-মাঝে সমুখের জঙ্গল ভাঙছে। শীতের রোদ ক্রমে-ক্রমে মরে আসছে। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই।

হঠাৎ অভয় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ কী! সামনে থেকে কলকল করে জলের আওয়াজ আসছে নাকি? না, কোনও ভুল নেই। শুখানালার শুকনো খাতে তীরবেগে এক জলস্রোত ছুটে আসছে যেন! প্রথমে দূরে শোনা যাচ্ছিল। দ্যাখ না-দ্যাখ শব্দটা কাছে চলে এল। প্রলয়ঙ্কর এক জলস্রোত মেল ট্রেনের মতো এসে পড়ল যে!

অভয় আর দেরি না করে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে পাড়ে উঠে পড়ল। তারপর সম্পূর্ণ বোকা বনে চেয়ে দেখল, এক ফোঁটাও জল নেই, কিন্তু জলের স্রোতের শব্দ ভীমবেগে বয়ে যাচ্ছে। সে চোখ কচলাল, ভাল করে দেখল। না, কোথায় জল? কিন্তু শব্দটায় কোনও ভুল নেই।

মিনিট-পাঁচেক পর শব্দটা বন্ধ হয়ে বনভূমি আবার নির্জন হয়ে গেল। ভয় পাবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না অভয় । ভয় পাওয়াই বোধ হয় উচিত।

তবে কিনা দুদিন ধরে সে এত ভয়ের মধ্যে আছে যে, নতুন করে আরও ভয় পাওয়া একটু কঠিন। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের লাঠিটা কয়েকবার নীরবে আস্ফালন করে খাতের ধার ধরে-ধরে হাঁটতে লাগল।

আচমকাই ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ফের তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কারা ওরকম হুঙ্কারে তেড়ে আসছে ঘোড়ায় চেপে? কয়েকশো ঘোড়ার ছুটন্ত খুরের আওয়াজ আর সেইসঙ্গে মানুষের রণং দেহি চিৎকার দূর থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে তারই দিকে! হাতের লাঠিটার দিকে কাতরভাবে একবার তাকাল অভয়। একটু আগেই সে “কে আসবি আয়" বলে খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল। এখন সেটা বেবাক ভুলে গিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল বোকার মতো। কারা আসছে তা এখনও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এল বলে। অভয় লাঠি ফেলে সভয়ে পাশের একটা ঝুপসি গাছে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে পড়ল। জীবনে গাছে

ওঠেনি সে, গাছ বাইতে জানেও না। কিন্তু প্রাণের দায়ে যতটা পারে ওপরদিকে উঠে একটা বেশ লতাপাতার আড়াল দেখে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসল। ওদিকে সৈন্য-সামন্তরা তেড়ে আসছে। ঘোড়ার ডাক; রণহুঙ্কার এবং অস্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে ঘোড়ার পায়ের খটখট শব্দ।

অভয় চোখ পলকহীন করে চেয়ে রইল নীচের দিকে। ঘোড়ার লেজটুকু বা মানুষের একটা মাথাও তার নজরে পড়ল না। অথচ বনভূমি প্রকম্পিত করে তার গাছের তলা দিয়ে এবং আশপাশ দিয়ে ওই ভয়ঙ্কর শব্দ বয়ে গেল খানিকক্ষণ ধরে। তারপর আবার সব চুপচাপ। নির্জন। শান্ত।

অভয় টপ করে নামল না। বুদ্ধিটা কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। চোখেও কি কম দেখছে আজকাল? খানিকক্ষণ বসে দম নিয়ে সে আবার ধীরেসুস্থে গাছ থেকে নেমে তার লাঠিগাছ কুড়িয়ে নিল।

জঙ্গলের মধ্যে এখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। একটু বাদেই ঘুটঘুটি হয়ে যাবে। অভয় আর এগোবে কিনা ভাবতে-ভাবতে এগনোই সাব্যস্ত করল। পিছিয়ে লাভ নেই। তার খোঁজে খুনিরা এসে পড়েছে। পেছনে জানা বিপদ, সামনে অজানা বিপদ। এগনোই ভাল।

দুপাও ভাল করে এগোয়নি অভয়, অমনই হঠাৎ তাকে আপাদমস্তক শিউরে দিয়ে সামনেই ধাঁ-ধাঁ করে একটা আগুনের শিখা মাটি থেকে উঠে খাড়া হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এরকম সোজা আর লম্বা আগুন জীবনে দেখেনি অভয়। অন্তত বিশ হাত উঁচু হয়ে লকলক করছে। চারদিক সেই আগুনের হলকায় একেবারে রাঙা হয়ে গেল। অভয়ের অবশ্য হাত থেকে লাঠিটা খসে পড়ে গেল মাটিতে মুখটা এমন হাঁ হয়ে গেল তার যে, একটা ছোটখাটো এরোপ্লেন ঢুকে যেতে পারে।

কিন্তু অভয় ভয় পেতে-পেতে ভয় থেকেই খানিক শিক্ষা নিয়েছে। কাজেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে হাঁ বুজিয়ে ফেলতে পারল এবং লাঠিটাও কুড়িয়ে

নিল। সামনে আগুনের শিখা তখন কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে নাচছে। বেশ একটা হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে সরু শিখার সবঙ্গে। অভয় চোখ চেয়ে আগুনের নাচ কিছুক্ষণ দেখল । তারপর হঠাৎ সে এক দুঃসাহসী কাণ্ড করে বসল। হাততালি দিয়ে বেশ হেঁকে বলে উঠল, "বাঃ, সুন্দর নাচ নেচেছ তো বাপু!"

অমনই দপ করে আগুনের শিখা মিলিয়ে গেল। চারদিকে নেমে এল ঘুটঘুটি অন্ধকার। জোনাকি পোকা জ্বলতে লাগল। ঝিঁঝিঁ ডাকতে লাগল। গাছে-গাছে পাখিদের তীব্র ঝগড়া, কাজিয়া চলতে লাগল। শেয়াল ডাকল দূরে। একটা অট্টহাসির মতো শব্দও শোনা গেল। বোধ হয় সেটা হয়েনার ডাক।

কাণ্ডগুলো যে ভুতুড়ে, তাতে অভয়ের সন্দেহ নেই। তবে ভয়ের ব্যাপারে মানুষ আর ভূত দুই-ই তার কাছে একাকার। ভূতে মারলেও মারবে, মানুষে মারলেও মারবে। সমুদ্রে শয়ান যার, শিশিরে কী ভয় তার? বরং তার মনে হল এখন ভূতটুতকে ভয় খাওয়া তার পক্ষে এক বাবুগিরি বা শৌখিনতার জিনিস। ওসব যারা সুখে আছে তাদেরই মানায়। তার মতো প্রাণ-হাতে-করা মানুষের কি ভূতের ভয় খেয়ে থেমে থাকলে চলে?

অভয় সুতরাং খানিকটা ভয়ে এবং খানিকটা অকুতোভয়ে এগোতে লাগল। সামনে যম-অন্ধকার, জঙ্গল, আঘাটা, কিন্তু হাতে লাঠি বাগিয়ে অভয় দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েই যেতে থাকল। আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "কাউকে না, আমি কাউকে ভয় খাই না। আয় না ব্যাটা কে আসবি! আয় না।"

হঠাৎ ফের উৎকর্ণ হতে হল অভয়কে। বহুদূরে কে একজন যেন বলে উঠল, "গায়।"

শোনার ভুলই হবে। এ জঙ্গলে কে কার গানের কথা বলবে? কিন্তু ফের কে যেন বলে উঠল, "খায়।"

খায়! অভয় মাথা নাড়ল, এ তো হতে পারে না । কে খায়? কী খায়? খাওয়ার কথা ওঠে কেন?

আবার আবছা সেই স্বরটা শোনা গেল, “যায়।”

যায়? উহুঁ, এটারও তো কোনও অর্থ হচ্ছে না! এর মানে কী?

অভয় দ্রুত হাঁটতে লাগল। পায়ের নীচে এখন ঘাস ছাড়া আর বিশেষ কোনও বাঁধা নেই। ঝোপঝাড়ও যেন কম। আর নালার পাশে বড় গাছও বিশেষ নেই যে, ধাক্কা খাবে।

খানিকটা এগনোর পর হঠাৎ এবার গলার স্বরটা বেশ স্পষ্টই শুনতে পায় অভয় । গায়, খায় বা যায় নয়। তবে কি হায়? না, তাও নয়। বহুদূর থেকে কে যেন করুণ স্বরে ধীরে ধীরে ডাকছে, “আয়...আয়...আয়...আয়...”

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অভয়ের। শরীরে একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল। এরকম করুণ, কান্নায় ভরা, অপার্থিব কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনেনি। তার মনে হল, এ স্বর বহুকাল ধরে আয়... আয়... আয়...”

অভয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পায়ে যেন পাথর বাঁধা, বুকটা ধকধক করছে। আর এগনো কি ঠিক হবে। তার মনে হচ্ছে সে যেন এক মহাভয়, মহাসর্বনাশ, মহাশোকের সমুদ্রের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। ওই শোক-সমুদ্রের ঢেউই যেন অনাদিকালের বিরহ বুকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে নিরবধি ডেকে চলেছে, “আয়. আয়... আয়...আয়...”

অভয় হাতের লাঠিটা বড় জোরে চেপে ধরেছিল নিজের অজান্তেই। আঙুলগুলো টনটন করে ওঠায় তার খেয়াল হল। মুঠোটা একটু আলগা করল সে। শরীরটাও আড়ষ্ট, শক্ত হয়ে গিয়েছিল। শরীরও এবার সহজ হল। অভয় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকভরে শ্বাস নিল। তারপর লাঠিটা মাটিতে কয়েকবার ঠুকে নিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, “কাউকে না, আমি কাউকে ভয় খাই না। আয় না ব্যাটা কে আসবি।” এই বলে সে এগোতে লাগল। বুক কাঁপছে, পা কাঁপছে। তবু অভয় থামল না।

টেনে-টেনে দীর্ঘ করুণ স্বরে কে যেন কাকে ডেকেই চলেছে, “আয়... আয়... আয়... আয়---” বিরামহীন। বিরক্তিহীন।

অভয় হাঁটতে লাগল। হাঁটতেই লাগল। রাত গাঢ় হল। গাছে-গাছে পাখিদের ঝগড়া থেমে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিক বড্ড নিঝঝুম। ঝিঁঝিঁর ডাক, নিজের পায়ের শব্দ আর সামনে ওই ক্ষীণ “আয়... আয়...” ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

হঠাৎ বনে মর্মরধ্বনি তুলে এই শীতের কুয়াশামাখা রহস্যময় রাতে একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল। শুকনো পাতা গড়িয়ে গেল বনময়। কোনও জঙ্গুলে ফুলের মোহময় গন্ধ ছড়াল হঠাৎ। আর তারপরেই অভয় একটা পেল্লায় হোচট খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে গেল।

অন্ধকারেও সে টের পেল, তার সামনে একটা বাধা।

হাতড়ে-হাতড়ে সে বুঝতে পারল, একটা পাথর বা সিমেন্টের থাম বা ওই জাতীয় কিছু। সেটা ডিঙিয়ে অভয় যেখানে পা দিল সেটা আগাছায় ভরা বটে, কিন্তু পায়ের তলায় ইট-সুরকি, পাথরের টুকরো, লোহার বিম, কাঠের বরগা ইত্যাদির একটা বিরাট ধ্বংসস্তুপ। টিলার মতো উচু সেই ধ্বংসস্তুপের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল অভয়। এখন সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, মাটির গভীর থেকে কে যেন ডাকছে, “আয়... আয়... আয়... আয়...”

অভয় ধীরে-ধীরে ধ্বংসস্তুপের ওপরে উঠে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সেই “আয়... আয়...” শব্দটা স্তব্ধ হয়ে গেল। আর তারপরেই চারদিকে যেন মৃদু একটা ঘূর্ণিঝড় উঠল। তার সঙ্গে উঠল গাছে-গাছে মর্মরধ্বনি। পাখিরা ঘুম ভেঙে ডেকে উঠল । তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পায়ের নীচে মাটিটা কি একটু দুলে উঠল? কে জানে! কিন্তু এটা স্পষ্ট টের পেল অভয়, ধ্বংসস্তুপে এতকাল যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা ছিল। সে এসে দাঁড়ানোর পর হঠাৎ সেই চাপা দীর্ঘশ্বাসটা বহুকাল পরে মুক্তি পেয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

অন্ধকারে চারদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু অভয়ের স্পষ্ট মনে হল, এই তার পূর্বপুরুষের ভিটে। শুখানালার সরকারবাড়ি। মস্ত বাড়ি ছিল একসময়ে, পাইক-বরকন্দাজ ছিল, মস্ত আস্তাবল ছিল, অনেক কিছু ছিল। সেই বাড়িতে বহুকাল পর একজন বংশধর ফিরে এসেছে। অভয় শীতে অন্ধকারে অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়েও আপনমনে একটু হাসল, তারপর মাটিতে লাঠিটা ঠুকে বলল, "এটা আমার বাড়ি। বুঝলে সবাই? এটা আমার বাড়ি।"

এ-কথা শুনে একটা তক্ষক ডেকে উঠল, "ঠিক ঠিক।"

**************

"ওই হচ্ছে শুখানালা! এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর যাব না।"

তিনু ভ্রূ কুঁচকে বলে, "যাবে না মানে! আলবাত যাবে। শুখানালা-ফালা আমরা জানি না। আমরা অভয় সরকারকে চাই। যতক্ষণ তাকে পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি তার জামিন।"

কালু কাতর মুখে বলে, "শুখানালা ভীম সরকারের এলাকা। এখানে কেউ ঢোকে না। এখানে নানারকম ভুতুড়ে কাণ্ড হয়। আঁতুড়ে ছেলের কান্না শোনা যায়, নালায় জল আসে, আরও সব । আমাকে ছেড়ে দিন।"

তিনু তার চপারটার চওড়া দিক দিয়ে কালুর পিঠে সজোরে মেরে ভয়ঙ্কর গলায় বলল, "বেশি ট্যাঁ-ফোঁ করলে কিন্তু কেটে রেখে যাব!"

ট্যাঁ-ফোঁ করার অবস্থা অবশ্য কালুর নয়। তার কোমরে শক্ত করে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ির প্রান্ত তিনুর বা হাতে জড়ানো। কালু যদি দড়ি ছিড়ে পালায়ও, তবে পেছনের তিনজনের তিনটে পিস্তল তাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। তাই সে ভয়ে ঘামতে লাগল। কাতর স্বরে বলল, "আমাদের এ এলাকায় ঢোকা বারণ।"

তিনু বলল, “শোনো বুদ্ধ, আমরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করি না। আমরা খুব প্র্যাকটিক্যাল লোক। যেমন-তেমন করে কাজ হাসিল করতেই আমরা ভালবাসি। ভূতপ্রেত যদি থেকেও থাকে তবে জেনো, তারাও আমাদের ভয় খায়।”

শুখানালার খাত দেখা গেল একটা বাঁশঝাড়ের পরেই। কালু দাঁড়িয়ে গেল, “ওই যে।”

“ওটাই শুখানালা! তা বেশ। অভয় সরকার ভিতু লোক, সে গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য অবশ্যই খাতের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকবে। সন্তু, দেখ তো, খাতের ভেতর কোথাও ঘাসটাস বে-গোছ হয়েছে কিনা।”

সন্তু অত্যন্ত অভ্যস্ত চোখে খাতের ধারে গিয়ে একটু দেখেই বলল, “এই তো এখানে ঘষটানোর দাগ রয়েছে। কুমড়োপটাশটা বোধ হয় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ তিনুদা, ওই যে ঘাসটাস লণ্ডভণ্ড করে জলহস্তীর মতো গেছে।”

তিনুর মুখে হাসি ফুটল, “তা হলে শিকার বেশিদূর যেতে পারেনি। ওই থলথলে শরীর নিয়ে আর কতদূরই বা যাবে!”

ল্যাংড়া বলল, “সে তো ঠিক কথা। কিন্তু এদিকে যে রোদ মরে আসছে তা দেখতে পাচ্ছ? অন্ধকার হয়ে গেলে কাজটা কঠিন হবে।”

তিনু ঘড়ি দেখল এবং আকাশের দিকে চাইল। তারপর বলল, “আমরা খাতে না নেমে যদি ধার দিয়ে-দিয়ে যাই তা হলে ওকে স্পট করতে সুবিধে হবে।”

কালু হঠাৎ গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, “আমি আর যাব না। আপনারা খুনখারাপ করবেন, সেটা চোখে দেখা আমার সহ্য হবে না। শুখানালার সীমানা ডিঙোলেও আমাদের বিপদ আছে, সে আপনারা ভূতপ্রেত মানুন বা না-মানুন।”

তিনু মোলায়েম স্বরে বলল,“আমরা পাঁচজন শক্তপোক্ত পুরুষ-মানুষ যদি ভয় খাই তবে অভয় সরকারের মতো ভেড়ুয়া শুখানালায় ঢুকল কী করে? তার ভয়ডর নেই? ওসব চালাকি ছাড়ো। গাঁয়ের লোকের অনেক কুসংস্কার থাকে।

ওসব আমরা মানি না। আর খুনের কথা বলছ? অভয় সরকারকে যদি না পাই তা হলে তোমার নিজের দশা কী হবে জানো? যা বলেছি ঠিক তাই করব, দু-আধখানা করে কেটে ফেলে রেখে যাব জঙ্গলে। চলো?"

কালু তবু সভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনু তাকে দমাস করে এমন একখানা ঘুসি মারল মুখে যে, কালু ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। সামনের একটা দাঁত উপড়ে গিয়ে গলগল করে রক্তে ভেসে গেল তার মুখ।

"ওঠ শয়তান।" হুকুম দিল তিনু।

কালু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। হাতে তার নিজের ওপড়ানো দাঁতখানা রক্তে ডুবে আছে। চোখে জল এল কালুর। নীরবে সে মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করল। পেছনে চার সশস্ত্র নিষ্ঠুর খুনি, তার পালানোর উপায় নেই।

তীক্ষ্ণ চোখে চারজন তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছে শুখানালার খাত। অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ছে অভয় সরকারের গমনপথ। তারা বেশ দ্রুতই এগোতে লাগল। শিকার আর দূরে নেই।

হঠাৎ এক জায়গায় দেখা গেল, খাতের মধ্যে মথিত ঘাসের চিহ্ন শেষ হয়েছে। অর্থাৎ খাতের মধ্যে অভয় সরকার ওখানেই ঘাপটি মেরে আছে।

তিনু চাপা গলায় বলে, "এইবার! শয়তানটা ওখানেই নিশ্চয় নেতিয়ে পড়ে আছে। লেট আস ফিনিশ হিম।"

কালুকে পেছন থেকে একটা লাথি মারল তিনু। কালু লাথি খেয়ে গড়িয়ে খাতের মধ্যে পড়ে গেল। পেছনে চারজন নেমে এল বেড়ালের মতো তৎপর পায়ে। চপার দিয়ে চারদিককার আগাছা সাফ করে যখন তারা সন্দেহজনক জায়গাটায় এল তখন দেখা গেল, সেখানে অভয় সরকার নেই।

পচা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, "ব্যাটা ওখান দিয়ে উঠে গেছে। ওই যে মাটির গায়ে দাগ।"

খাত থেকে অভয় যেখানে উঁচু পাড়ে উঠেছিল সে জায়গায় নরম মাটিতে তার হাঁচোড়-পাঁচোড়ের দাগ এখনও টাটকা। পাঁচজন জায়গাটা দেখছিল।

আচমকা দূরে এক জলকল্লোল শুনতে পেল পাঁচজনই। তিনু কালুর দিকে ফিরে বলল, "এখানে ঝরনা আছে কোথাও? শব্দ কিসের? এতক্ষণ তো শুনতে পাইনি!"

কালুর মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে। ঠোঁট কাঁপছে। সে মাথা নেড়ে জানাল, এখানে ঝরনা নেই।

তিনু জলের শব্দ যেদিক দিয়ে আসছে সেদিকে চেয়ে থেকে বলল, "এ তো দেখছি সাঙঘাতিক স্রোতের শব্দ! নিশ্চয়ই পাহাড়ি নদীটদী আছে।"

কালু অস্ফুট গলায় বলল, "কাজটা আপনার ভাল করেননি। এই এলাকা ভীম সরকারের। আমরা কেই ওকে চটাই না।"

"চোপ" বলে তিনু একটা ধমক দিল। বস্তুত সে বুঝছিল না যে, জলের শব্দ শুনে কালুর এত ভয় পাওয়ার কী আছে। ঝরনা বা পাহাড়ি নদীর শব্দ তো এরকমই হয়!

পচা বলল, "অভয় তা হলে আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে! তিনুদা, আজ আর আমাদের সন্ধের গাড়িটা ধরা হল না। অলরেডি সন্ধে হয়ে এল। দেখেছ কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক?"

তিনু চিন্তিতভাবে ঘড়ি দেখে বলল, "দেখছি। কিন্তু আমার হিসেবমতো অন্ধকার হতে আরও আধঘণ্টা লাগা উচিত। এত তাড়াতাড়ি তো আলো মরে যাওয়ার কথা নয়।"

ল্যাংড়া বলে, "জঙ্গলে তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়, এ তো সবাই জানে।"

তিনু তবু চিন্তিতমুখে ভু কুঁচকে আকাশটা দেখল। আর আচমকাই সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ও কী?"

প্রত্যেকেই চমকে সামনের দিকে ঘুরে তাকাল। দূরের জলকল্লোল কাছে চলে এসেছে এবং মেলট্রেনের মতোই ধেয়ে আসছে প্রলয়ঙ্কর জলরাশি। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে সফেন জলরাশির শীর্ষে ঢেউ যেন লক্ষ হাত তুলে প্রবল এক প্রতিবাদেই ধেয়ে আসছে।

তিনুকে এই প্রথম ভয় পেতে দেখা গেল, সে চেঁচিয়ে কালুকে ধমকাল, “এই বদমাশ! ওঠ ওপরে, আমাকে টেনে তোল।”

কালু তিলমাত্র দেরি না করে এক লাফে ওপরে উঠে গেল। তিনু আর তার তিন সঙ্গীও উঠে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে উত্তাল জলরাশি কুল ছাপিয়ে ধেয়ে এল। তীর থেকে তাদের চারজনকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে তরঙ্গে-তরঙ্গে লোফালুফি করতে-করতে নিয়ে চলে গেল!

কালুরও যাওয়ার কথা। কিন্তু ভাগ্য ভাল, কোমরের দড়ির প্রান্তটা তিনু ধরে রাখতে পারেনি।

কালু আর দাঁড়াল না। প্রাণপণে পিছু ফিরে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতেই দেখতে পেল, শুখানালা খটখট করছে শুকনো । কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নেই শব্দ নেই। স্রোত নেই।

কুঞ্জখুড়ো পুরস্কারের পরিমাণ দু’লাখ পর্যন্ত বাড়িয়ে ঢাঁড়া পিটিয়ে দিলেন। ঢাড়াওয়ালা যখন থানার সামনে দিয়ে ঢাঁড়া বাজিয়ে চোঙা ফুকে সুসংবাদটি প্রচার করে গেল তখন আর সুদর্শনবাবু থাকতে পারলেন না । মোট চারজন নির্ভরযোগ্য সেপাইকে ডেকে লাইন আপ করিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, “তোমরা কে কে দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত?”

সেপাই লালারাম এই কথায় বুক ফুলিয়ে বলল, “দেশের জন্য হুজুর, জান তো জান, এক মাহিনীর তলব ভি দিয়ে দিব।”

সেপাই মগন বলল, “দো মাহিনীক তলব আর জান ভি।”

কিচলু বলল, “হাঁ হাঁ জরুর, কিউ নেহি। জান লিবেন সো তো আচ্ছা বাত আউর হামার তিন মাহিনাক তনখা আর দোটো ভৈস ভি দিয়ে দিব মালিক।”

রামু বলল,“আজ্ঞে, আমার ছেলেবেলা থেকে ক্ষুদিরামের মতো দেশের জন্য ফাঁসিতে ঝোলার বড় শখ। তা হুজুরের দয়ায় সেরকমটা হলে বড় ভাল হয়। আর ফাঁসিতে যেতে-যেতে ওই গানটাও কিন্তু আমাকে গাইতে দিতে হবে, হাসি হাসি পরবো ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী...”

লালারাম বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, “হজৌর, জান কখুন দিতে হোবে? জারা আগারি বললে থোড়া বহুত রোটি আর মূলি কি সজী খায়ে লিব। আউর এক লোটা দুধ।”

মগন বলল, “হামি জারা রামজিকি ভজন ভি কোরে লিব। আউর এক দফে পূজা চড়িয়ে দিব বজরঙ্গবলী কি মন্দিরমে।”

কিচলু মাথা চুলকে বলে, “এক দফে হরদোয়ার ঘুমে আসলে দেশক লিয়ে জান দেনে সে কোই হরজা নেহি।”

রামু বলল, “আমার ওসব নয় বাবা। কলকাতার রায়ট রেস্টুরেন্টের কবিরাজি কাটলেট আর মোগলাই পরোটা একবারটি খেয়ে নিলেই হবে। আর একটা হিন্দি সিনেমা।”

সুদর্শনবাবু রুমালে কপাল মুছতে-মুছতে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করে বললেন, “ওসব মতলব ছাড়ো। দেশ তোমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করতে ডাকছে। এখনই, এই মুহুর্তে। আর সময় নেই। একটু আগে শুনলে তো, চোঙা ফুকে কী বলে গেল!”

লালারাম অবাক হয়ে বলে, “উতো কুঞ্জবাবুক কোঠি মে ডাকাকা বাত। উনকো লুটা মাল আপস লানে পর কুছ মিলেগা!”

সুদর্শনবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, “কুছু নয় রে বাবা, কুছ নয়। কুছ বলে তুচ্ছ করিস না। দু লাখ! বুঝলি! দু লাখ!"

“হাঁ হাঁ, দো-চার লাখ কোই বাত নেহি।”

সুদর্শনবাবু অবাক হয়ে বলেন, “বলিস কী? দু-চার লাখ কোনও কথাই নয়! দু লাখে কত হয় জানিস? দুশো হাজার টাকা।”

“হোবে মালিক। হামি গরিব আদমি। দো-পাঁচ জানি, দো-চারশো জানি, লেকিন উসকা জেয়াদা কুছু জানি না।”

রামু বিরক্ত হয়ে বলে, “কিন্তু কী করতে হবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না বড়বাবু!”

“বলছি, বলছি। ডাকাতরা শুখানালার সরকারদের পোড়ো বাড়িতে সব মাল মজুদ করেছে। মালটা আমাদের উদ্ধার করতে হবে।”

শুখানালার নাম শুনেই চারজন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। লালারাম বলল, “উ হোবে না মালিক।”

একগাল হেসে সুদর্শনবাবু বললেন, “শোন রে শোন, আমি ঠিক করেছি তোদের চারজনকে পাঁচ. না, পাঁচ কেন, দশ-দশ হাজার করেই দেব। বাকি লাখ-দেড়েক আমার থাকবে।”

“উ হোবে না মালিক।”

রামু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, “মোটে দশ হাজার। ধুস!”

সুদর্শনবাবু বললেন, “আচ্ছা, না হয় আরও হাজার টাকা দিলুম।”

রামু মাথা নাড়ল, “পোষাচ্ছে না সার।”

বেশ কিছুক্ষণ দরদরির শেষে ঠিক হল, সেপাইরা পচিশ হাজার করে পাবে। সুদর্শনবাবু পুরো এক লাখ। স্টেশনের লাখন, গাঁয়ের নেতাই, রেমো, আর অক্ষয়কে নিতে হবে। তারা শুখানালা যাওয়ার একটা শর্টকাট চেনে। তবে ওদের কোনও ভাগ দেওয়া হবে না। পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেওয়া হবে শুধু। কাল শেষ রাতেই রওনা দিতে হবে।

স্তুপের ওপর সারারাত লাঠি হাতে বসে রইল অভয় । বসে-বসেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল । ঘুম যখন ভাঙল তখন চারদিকে যেন স্বর্গের ছবি। কুয়াশামাখা আকাশে দিপ-দপ করছে নিবন্ত সব তারা। পাখি ডাকছে। আর শরীরে যেন আনন্দের ঢল নেমে এসেছে অভয়ের। মনটা হালকা, শরীরটাও ভারী ফুরফুরে। সে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখল। এখনও ফরসা হয়নি বটে, কিন্তু শেষ-রাতের মরা-জ্যোৎস্নায় অনেকটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এ-বাড়িতে ছিল বিশাল বাগান, পুকুর, আস্তাবল, গোয়াল, ছিল নহবতখানাওয়ালা ফটক, কাছারি। কালের অমোঘ নিয়মে সব মাটিতে মিশে গেছে। তবু এই ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে তার খুব চেঁচাতে ইচ্ছে করল আনন্দে। তাই সে চেঁচাল, "এই হচ্ছে আমার বাড়ি ! আমার বাড়ি!"

সেই শুনে যেন একটা পাথরের পরি তার শেষ ঠেকনোটা ভেঙে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল। দু-আধখানা হয়ে গেল ভেঙে!

"আহা রে!" বলে এগিয়ে গিয়ে অভয় পরিটাকে তুলতে গেল । এবং সবিস্ময়ে দেখল, পরির ফাঁপা পেটের ভেতরে একটা লোহার বাক্স। কাঁপা হাতে সে বাক্সটা তুলে নিয়ে খুলল। যা দেখল তা অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

বাক্সটা বুকে ধরে চুপ করে বসে রইল অভয়। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠল। অভয় উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "আমি আবার সব গড়ে তুলব।"

নিজের গলার স্বর শুনে অভয় চমকাল না বটে, কিন্তু চারদিক চমকাল। অভয় নিজে বুঝতেও পারল না সে কতটা বদলে গেছে এক রাতে। সেই থলথলে, ভিতু, করুণার পাত্র অভয় আর নেই। বদলে দাঁড়িয়ে আছে এক শক্তিমান পুরুষ, অকুতোভয়। তার চোখে ঝলকাচ্ছে আত্মবিশ্বাস।

অভয় জানতেও পারল না, জঙ্গলের ভেতরে ঝোপঝাড় ভেঙে সুদর্শনবাবু আর তাঁর দলবল একটা বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। চারজনের হাতে রাইফেল, পাকা বাঁশের লাঠি।

রেমো বলল, "হুজুর, এই হল সরকার-বাড়ির চৌহদ্দি। আমাদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য ভাল যে, এই অবধি আসতে পেরেছি।"

একটু ধরা গলায় অক্ষয়ও বলল, "ভীম সরকারের এলাকায় কখন যে কী ঘটে যায় কিছু বলা যায় না।"

বাঁশঝাড়ের আড়াল পেরিয়ে তারা ধ্বংসস্তূপটার মুখোমুখি হল।

সুদর্শনবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ওটা কে রে, ওই উঁচুতে দাঁড়িয়ে? ডাকাত নাকি?"

আচমকাই অক্ষয় বিকট আর্তনাদ করে উঠল, "ওরে বাবা, ও যে ভীম সরকার! সেই ন্যাড়ামাথা! সেই তেজী চেহারা! ওরে বাবা রে..."

রেমো চোখ বুজে "রাম, রাম" করতে-করতে কাঁপা গলায় বলল, "বড়বাবু! আজ আর রক্ষে নেই। কাঁচাখেগো দেবতা যে! ওই তো ভীম সরকার..."

নেতাই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, "আপনার জন্যই এই সর্বনাশটা হল বড়বাবু! ভীম সরকার আর রক্ষে রাখবে না."

তিনজন ঘুরে দৌড়তে শুরু করতে-না-করতেই চারজন সেপাই "আই বাপ রে" বলে তাদের পিছু নিল। ভয় জিনিসটা অতি সংক্রামক, সুদর্শনবাবু অতি সাহসের সঙ্গে আরও ছয় সেকেন্ড দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিলেন । হ্যাঁ, ভীম সরকার হতেও পারে।

দু লাখ টাকার কথা বেবাক ভুলে সুদর্শনবাবুও ঘুরে দৌড়তে লাগলেন। তাঁর ভুড়ি প্রবলবেগে লাফাতে লাগল। প্রতিবাদ করতে লাগল হাঁটু । তবু প্রাণের ভয় বড় ভয় । তিনি তিলেক দাঁড়ালেন না। শুধু বলতে লাগলেন, "ওরে, তোরা

আমাকে একা ফেলে যাসনি। ধর্মে সইবে না। দুনিয়ায় দারোগাদের মতো দুর্গতি আর কারও নেই রে বাপ। কবে যে তোরা দারোগার দুঃখ বুঝবি!”

আর-একটা ঝোপের আড়াল থেকে দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ এক মানুষও অভয়কে দেখছিলেন। তিনি ব্রহ্মদৈত্য। অভয়কে চিনতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়নি। তবু তিনি দেখছিলেন, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে একটা মানুষ কত বদলে যায়। কালকেও এ-লোকটা ছিল অসহায়, দুর্বল, ভিতু। আর আজ!

জঙ্গলের ওপর দিয়ে একটা ঝটকা হাওয়া বয়ে গেল। একটা সবুজ পাতা খসে পড়ল অভয়ের ন্যাড়া মাথায়। যেন এইমাত্র কেউ সবুজ একটা রাজমুকুট পরিয়ে দিল তার মাথায়। ক্লান্ত দেখাচ্ছিল অভয়কে। তবু মনে হল, রণক্লান্ত এক দিগ্বিজয়ী রাজা।

গৌরবর্ণ পুরুষটি স্মিত হাসলেন। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন, “দুঃখী মানুষ, তোমার ভাল হোক।”

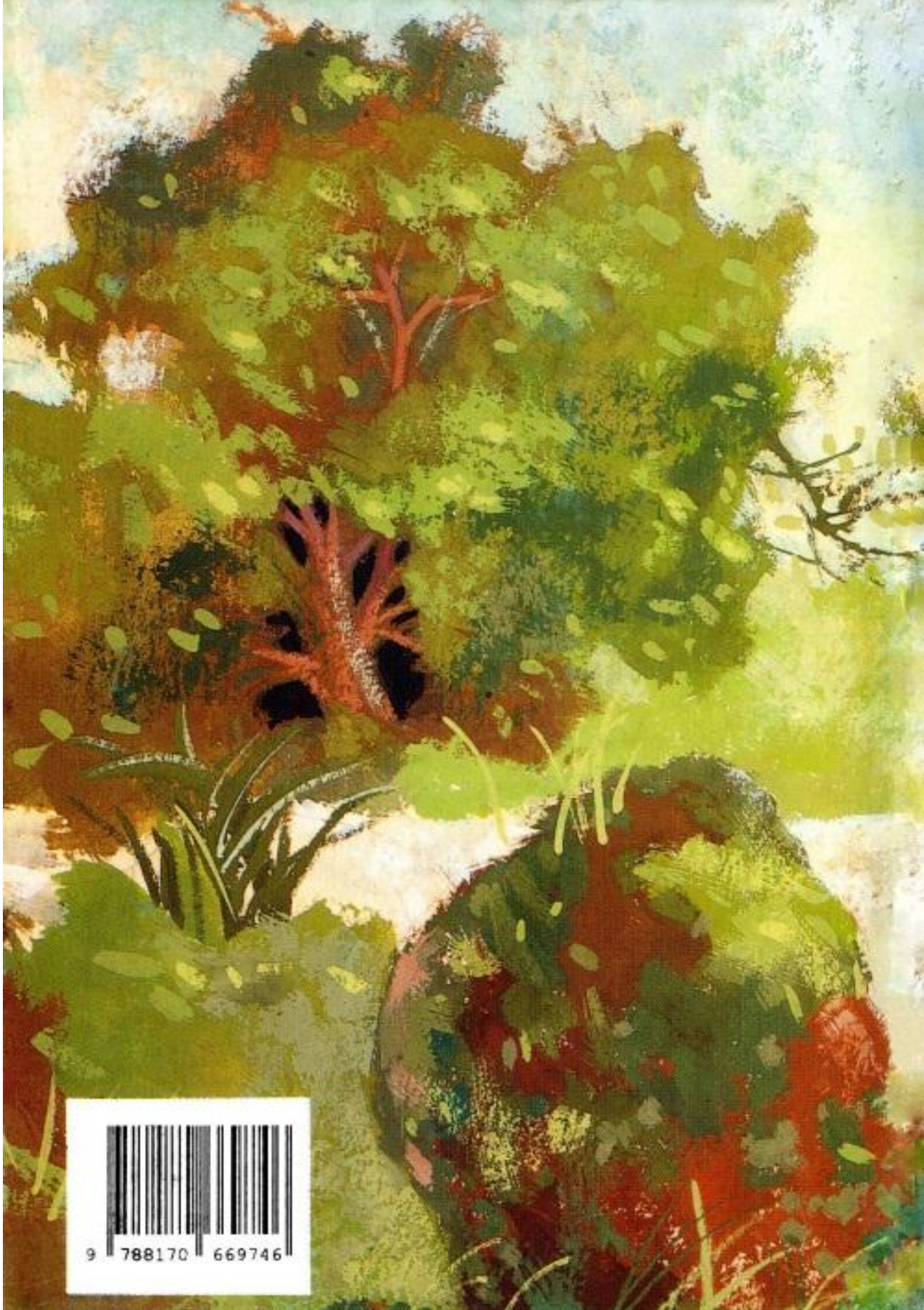

9 788170 669746